গণশক্তি

নব পর্য্যায়, প্রথম সংখ্যা
আগষ্ট, ১৯৩৮

শারদীয়ার

উপহারে
প্রসাধনে
প্রক্ষালণে
স্নানে

শিশির সাবানই

পরাগ
চন্দন
রেণু
নীম

শ্রেষ্ঠ প্রসাধন

জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডের অভিজ্ঞ বাঙালী বিশেষজ্ঞ পরিচালিত

শিশির সোপ ওয়ার্কস্, দমদম্

ফোন—বড়বাজার ১১৩৫

প্রতি সংখ্যা দু' আনা। সম্পাদক—মনোরঞ্জন রায় সডাক বার্ষিক—দু' টাকা
অফিস :—গণশক্তি পাবলিশিং হাউস, ২৫নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

সূচী

বিষয়	পাতা
১। রাষ্ট্রপতির শুভ কামনা	১
২। যুদ্ধ বিরোধ হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	২
৩। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তার দীনবন্ধু রায়	৪
৪। ভবিষ্যদ্বাণী (কবিতা) অরুণ মিত্র	৮
৫। জগতের সর্ব্বহারা শ্রেণীর ঐক্য ডিমিট্রভ	৯
৬। কংগ্রেসের কাজ সোমনাথ লাহিড়ী	১৪
৭। কানপুর হরতাল বিশ্বনাথ দুবে	১৮
৮। স্বাধীনতা ও পল্লীসমাজ সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী	২১
৯। ভারতে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিভূতি গুহ	২৭
১০। যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতা সম্পাদকীয়	৩১

গণশক্তির পরিচালকগণ

মুজফ্‌ফর আহমদ

বঙ্কিম মুখার্জ্জী — নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী — দেবকুমার দাস

সোমনাথ লাহিড়ী

গণশক্তির নিয়ম

১। প্রতি ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখে গণশক্তি বের হয়।

২। এজেণ্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাবেন। অবিক্রীত কাগজ শতকরা ৫ খানা করে ফেরৎ নেওয়া হয়। কাগজ পাঠাবার ব্যয় "গণশক্তি"র প্রকাশকেরা বহন করেন। কিন্তু মনিঅর্ডার পাঠাবার ও কাগজ ফেরৎ পাঠাবার ব্যয় এজেণ্টগণকে বহন করতে হবে।

৩। কাগজ নেওয়ার জন্যে শতকরা ১৫ টাকা হারে এজেণ্টগণকে আমাদের আফিসে ডিপজিট রাখতে হয়। কাগজের মূল্য প্রত্যেক ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঠিয়ে দিতে হয়।

৪। "গণশক্তি"র বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত দু'টাকা এবং ষান্মাসিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত এক টাকা প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'আনা।

৫। "গণশক্তি"তে বিজ্ঞাপন দিবার জন্যে ও অন্যান্য সব বিষয় জানবার জন্যে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হয়ঃ—

ম্যানেজার

—গণশক্তি পাবলিশিং হাউস—

২৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

কৈফিয়ৎ

আমরা সকলকে জানিয়েছিলেম যে "গণশক্তি" ৪০ পৃষ্ঠার কাগজ হবে; কিন্তু, এবারে খুব তাড়াতাড়ি বের করতে হওয়ায় আমরা ৩৪ পৃষ্ঠা দিয়েছি। সেজন্যে আমরা সকলের নিকটে ক্ষমা চাইছি। এর পরের সংখ্যা থেকে আমরা ৪০ পৃষ্ঠা ক'রে ছাপাব।

=পরিচালক মণ্ডলী=

গণশক্তি

১ম সংখ্যা | আগষ্ট, ১৯৩৮ | নব পর্য্যায়

রাষ্ট্রপতির শুভ-কামনা

যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরোধিতায় স্বাধীনতা সংগ্রাম

আপনাদের "গণশক্তি"র জন্য কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সমস্যা তো দেশের সম্মুখে অনেকই আছে, কিন্তু আজ সমস্যা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলেই সকল সমস্যার প্রথমে প্রস্তাবিত যুক্ত-রাষ্ট্র সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া উপস্থিত হয়। ভারতের পরাধীনতার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য যুক্ত-রাষ্ট্রের যে পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে তাহাই এখন ভারতের এক ও অদ্বিতীয় প্রশ্ন।

কংগ্রেস সুনিশ্চিতরূপে যুক্ত-রাষ্ট্রের এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। বিদেশী শাসনকর্ত্তৃক রচিত কোন শাসনতন্ত্রই ভারতবাসী চাহে না; এইরূপ যে কোন শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিবার জন্য কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদই শুধু ভারতের শাসন-তন্ত্র গঠন করিবে—ইহাই কংগ্রেসের দাবী।

নিখিল বিশ্বের রাজনীতিক পরিস্থিতি আজ আমাদের দেশেও এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতেছে। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতি এতটুকু দুর্ব্বলতাও দেশের স্বাধীনতার প্রতি গভীর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কারণ উহাতে স্বাধীনতাকামী শক্তির অপচয় হইবে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়তা হইবে।

পৃথিবীর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহের পরস্পর-বিরোধিতায় বর্ত্তমানে আমরা এমন অনুকূল অবস্থায় পৌঁছিয়াছি যে সমগ্র জাতি একত্র হইয়া মিলিত কণ্ঠে দাবী জানাইতে পারিলেই আমাদের দাবী সম্পূর্ণ মিলিয়া যাইবে। এ অবস্থায় মুক্তিকামী সমস্ত শক্তির একত্র সমাবেশ ও সংহতি সকলের আগে প্রয়োজন। গণ-মানবের প্রাথমিক দাবীর ভিত্তিতে জনগণকে আমাদের সংগঠিত করিতে হইবে ও যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতি তীব্র বিরোধিতার ভিত্তিতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে।

আশা করি আপনাদের "গণশক্তি" এই জাতীয় সংহতিকে জয়যুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবে। কোনো বিশেষ শ্রেণীর কথা ছাড়াও আশা করি আপনাদের "গণশক্তি" সকল শ্রেণীর ন্যায্য অধিকারের জন্য সংগ্রাম করিবে।

আমার আন্তরিক শুভ-কামনা গ্রহণ করুন।

১৪।৭।৩৮

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

যুদ্ধ বিরোধ

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বার-য়্যাট-ল

পয়লা আগষ্ট তারিখে সমস্ত পৃথিবীতে যুদ্ধবিরোধ দিবস প্রতিপালিত হবে। যুদ্ধবিরোধ আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত আছে বলে তার যথার্থ তাৎপর্য্য আমাদের বিশেষ করে জানা দরকার।

যুদ্ধবিরোধ শুধু নিষ্ক্রিয় শান্তিপ্রিয়তা একেবারেই নয়। সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে তার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাম্রাজ্যতন্ত্রের উচ্ছেদই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিছুকাল ধরে প্রায়ই শোনা গেছে যে শীঘ্রই ১৯১৪-১৮ সালের মত আবার মহাযুদ্ধ বেধে যাবে; মানুষকে মারবার আর যন্ত্রণা দেবার ব্যবস্থা বিজ্ঞানের কল্যাণে আগের চেয়ে এগিয়ে গেছে বলে এবারকার যুদ্ধ আরও ব্যাপক, আরও দারুণ হবে।

ফ্যাশিজম্ আজ সভ্যতার বিরুদ্ধে, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ১৯৩১ সাল থেকে মহাচীনে জাপানের বর্ব্বর অভিযান চলেছে। অ্যাবিসীনিয়া ও স্পেনে ইতালীয় ফ্যাশিজ্‌মের নৃশংস মূর্ত্তি আমরা দেখেছি। মধ্য ইউরোপে ও স্পেনে হিট্‌লারী দলের দম্ভ ও অত্যাচার সকলেই লক্ষ্য করেছেন। ফ্যাশিষ্টরা সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজিদারদলের সাহায্য পেয়ে এসেছে। বিশেষত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের সাধারণ লোকের চোখে ধূলা দেবার জন্য বকধার্ম্মিক সাজবার চেষ্টা করে আসলে ফ্যাশিষ্টদেরই সমর্থন করে চলেছে। নিজেদের মধ্যে বিষম রেষারেষি সত্ত্বেও গণশক্তিকে পঙ্গু করার জন্যই সর্ব্বদেশের ধনিক, সর্ব্বদেশের সাম্রাজ্যবাদী এক্‌কাট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফ্যাশিজ্‌ম্ যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল, যুদ্ধ ফ্যাশিজ্‌মের একটা অঙ্গ। সমস্ত ফ্যাশিষ্ট দেশে যুদ্ধের আয়োজনই হচ্ছে সরকারের প্রধান কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকের মধ্যে যুদ্ধ-মনোবৃত্তি জাগানো হচ্ছে তার প্রধান চেষ্টা। তাই ফ্যাসিজ্‌মের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা দেশে গণশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে। ফ্যাসিষ্টরা এখন আর পূর্ব্বের মত খোলাখুলি যুদ্ধঘোষণা করে লড়াই করতে চায় না। তারা গৃহবিবাদ বাধিয়ে দিয়ে পুঁজিদার-জমিদারের দলকে সাহায্য করে, গণতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করে। জার্ম্মাণী, ইতালী, জাপান ছাড়া পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিষ্টদেরই প্রভুত্ব; ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বন্ধু। সকল সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রগতিবিরোধীরা তাদের সহায়তা করেছে।

কিন্তু আজ পৃথিবীর একষষ্ঠ অংশে সোভিয়েট শাসন সুপ্রতিষ্ঠ রয়েছে; এই হচ্ছে সকল দেশের প্রগতিবিরোধীদের চক্ষুশূল। সমাজতন্ত্রের সাফল্যকে ধনিকবাদ যমের মত ভয় করে বলে সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিস্পিষ্ট করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। চীনের গণজাগরণকে সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা বিষম ভয় করে বলে ঈর্ষা সত্ত্বেও জাপানকে অন্যান্য সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রতিরোধ করছে না। নানা দেশে চাষীমজুরের দল সাম্যবাদ গ্রহণ করেছে, বিপ্লবের জয় ঘোষণা করেছে দেখে মালিকরা শঙ্কিত হচ্ছে, তাদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ফ্যাসিজ্‌মের সঙ্গে মিতালি করছে। ধনিকবাদ কিছুকাল পূর্ব্বেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন পেয়ে এসেছে; কিন্তু ফ্যাসিজ্‌মে মুমূর্ষু ধনিকবাদের উলঙ্গ রূপ দেখে তাদের অনেকেই আজ সম্মিলিত গণশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্য চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন শ্রমিক কৃষকের সাহায্য নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। মেক্সিকোয় ইংরেজ আর আমেরিকান ধনিক বিপদে পড়েছে। প্যালেষ্টাইনে ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্র ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আফ্রিকার গণশক্তি জেগে উঠেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার সকল পদানত জাতিই আজ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

ফ্যাসিজ্‌ম্ আর সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক হচ্ছে যমজ সম্পর্ক; সর্ব্বদেশের মুক্তি আন্দোলন তাই ফ্যাসিষ্টবাদকে প্রত্যাখ্যান করবে, প্রতিরোধ করবে, বিনাশ করবে, ফ্যাসিজ্‌ম্ ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের কবরের উপর নূতন পৃথিবী স্থাপন করবে।

শান্তিবাদীদের মধ্যে অনেকেই চান্ যে ফ্যাসিষ্টদের শান্ত করার জন্য এসিয়া, আফ্রিকার মত "পশ্চাৎপদ' মহাদেশে কয়েকটা উপনিবেশ তাদের দেওয়া উচিত। এ প্রস্তাবকে আমরা ঘৃণাকরি; এরকম প্রস্তাব আমরা কখনও বরদাস্ত করতে পারি না। গরু-ভেড়ার মত আমাদের এক খোঁয়াড় থেকে আর খোঁয়াড়ে সরাবার উদ্যোগকে আমরা কোনমতে সহ্য করতে পারি না। ঘুষ দিয়ে লোলুপ ধনিকদের যারা সন্তুষ্ট করতে চায়, তারা শুধু নির্ব্বোধ নয়, তারা আমাদের মুক্তি আন্দোলনের শত্রু। ঐ জঘন্য উপায়ে যারা যুদ্ধ আট্‌কাতে চায়, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সংস্পর্শ থাকতে পারে না।

অনেকে আবার আছেন যাঁরা মনে করেন যে যখন ধনিকবাদের আমলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী আর সাম্যবাদই যখন যুদ্ধের একমাত্র সমাধান, তখন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধায়োজন সম্বন্ধে আমাদের মাথা না ঘামানোই উচিত। কিন্তু এই মত অনুসারে কাজ করলে সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করা হবে। একথা অবশ্য ঠিক যে ধনিকবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ শেষপর্য্যন্ত কিছুতেই যুদ্ধকে বর্জ্জন করতে পারে না। কিন্তু কোন কোন সময়, কয়েকটী বিশেষ ঘটনার সমাবেশে ধনিকতন্ত্রী দেশেও যুদ্ধবিরোধী মনোভাব থাকে। প্রায় দুবছর আগে ইংলণ্ডে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে ভোট নেওয়া হয়েছিল, তা এই কথার প্রমাণ। সেই যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের সুযোগ আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়। ধনিকবাদকে বাঁচিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার বৃথা চেষ্টা আমরা করতে চাই না বটে; ধনিকবাদ থাকলে যুদ্ধও থাকবে। কিন্তু এখন অন্তত কিছুকালের জন্য যুদ্ধকে আট্‌কানো বিশেষ দরকার, আর তাই ধনিকবাদ দূর করে সাম্যবাদ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই আমরা এখন যুদ্ধকে অন্তত স্থগিত রাখার চেষ্টা করব।

যুদ্ধকে এখন আটকাবার চেষ্টা করার কয়েকটি গুরুতর কারণ আছে। প্রথমত নূতন এক মহাযুদ্ধে শুধু যে বহু লোকের প্রাণ যাবে তা নয়, মানবজাতির সংস্কৃতিও পিছিয়ে যাবে। অবশ্য সাম্যবাদীবিপ্লবের বিজয় আস্‌বেই, কিন্তু তা সুদূর পরাহত হয়ে যাবে, বিপ্লবী সংগ্রাম আরও কঠোর হয়ে পড়বে। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধকে প্রতিহত রেখে গণশক্তিকে জাগ্রত যদি করা যায়, তাহলে আর বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না, গণসাধারণের সহ্য শক্তিকে নিদারুণভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে যুদ্ধকে যতই পেছিয়ে দেওয়া যাবে, ততই সাম্যবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির সময় পাওয়া যাবে। সাম্রাজ্য-বাদের শক্তিক্ষয় হবে, ফ্যাসিষ্টদেশে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্ভাবনা বাড়বে। যুদ্ধকে আট্‌কে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নে সাম্যবাদ আরও শক্তিমান হবে, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার উদ্যোগ সম্পূর্ণ হবে, সমগ্র পৃথিবীতে সাম্যবাদী বিপ্লবের সাফল্য শীঘ্রই সম্ভব হবে। যুদ্ধবিরোধ গণ আন্দোলনকে বিজয়ের পথে অগ্রসর করে দেবে। আর এক কারণ হচ্ছে এই যে যুদ্ধবিরোধ আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিকামী জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা সহজ হবে; যুদ্ধে যাদের কোন স্বার্থ নেই, যুদ্ধ যাদের কাছে কেবল একটা বিকট বিপত্তি বলে মনে হয়, সেই জনসাধারণকে ধনিকবাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বোঝান যাবে।

সম্প্রতি গান্ধীজী বলেছেন যে চীন যদি জাপানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে পূর্ণ অহিংসভাবে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হয়, তাহলে তাদের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসকে বদ্‌লে দিতে পারে। তাঁর এ অভিমতে যুদ্ধবিরোধ আন্দোলন সায় দিতে পারে না। ফ্যাসিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করতেই হবে; সেক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা অহিংসার পরাকাষ্ঠা হলেও গণ-

সূচী

বিষয়	পাতা
১। রাষ্ট্রপতির শুভ কামনা	১
২। যুদ্ধ বিরোধ হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	২
৩। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তার দীনবন্ধু রায়	৪
৪। ভবিষ্যদ্বাণী (কবিতা) অরুণ মিত্র	৮
৫। জগতের সর্ব্বহারা শ্রেণীর ঐক্য ডিমিট্রভ	৯
৬। কংগ্রেসের কাজ সোমনাথ লাহিড়ী	১৪
৭। কানপুর হরতাল বিশ্বনাথ দুবে	১৮
৮। স্বাধীনতা ও পল্লীসমাজ সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী	২১
৯। ভারতে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিভূতি গুহ	২৭
১০। যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতা সম্পাদকীয়	৩১

গণশক্তির পরিচালকগণ

মুজফ্‌ফর আহমদ

বঙ্কিম মুখার্জ্জী — নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী — দেবকুমার দাস

সোমনাথ লাহিড়ী

গণশক্তির নিয়ম

১। প্রতি ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখে গণশক্তি বের হয়।

২। এজেণ্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাবেন। অবিক্রীত কাগজ শতকরা ৫ খানা করে ফেরৎ নেওয়া হয়। কাগজ পাঠাবার ব্যয় "গণশক্তি"র প্রকাশকেরা বহন করেন। কিন্তু মনিঅর্ডার পাঠাবার ও কাগজ ফেরৎ পাঠাবার ব্যয় এজেণ্টগণকে বহন করতে হবে।

৩। কাগজ নেওয়ার জন্যে শতকরা ১৫ টাকা হারে এজেণ্টগণকে আমাদের আফিসে ডিপজিট রাখতে হয়। কাগজের মূল্য প্রত্যেক ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঠিয়ে দিতে হয়।

৪। "গণশক্তি"র বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত দু'টাকা এবং ষান্মাসিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত এক টাকা প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'আনা।

৫। "গণশক্তি"তে বিজ্ঞাপন দিবার জন্যে ও অন্যান্য সব বিষয় জানবার জন্যে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হয়ঃ—

ম্যানেজার

—গণশক্তি পাবলিশিং হাউস—

২৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

কৈফিয়ৎ

আমরা সকলকে জানিয়েছিলেম যে "গণশক্তি" ৪০ পৃষ্ঠার কাগজ হবে; কিন্তু, এবারে খুব তাড়াতাড়ি বের করতে হওয়ায় আমরা ৩৪ পৃষ্ঠা দিয়েছি। সেজন্যে আমরা সকলের নিকটে ক্ষমা চাইছি। এর পরের সংখ্যা থেকে আমরা ৪০ পৃষ্ঠা ক'রে ছাপাব।

=পরিচালক মণ্ডলী=

গণশক্তি

১ম সংখ্যা | আগষ্ট, ১৯৩৮ | নব পর্য্যায়

রাষ্ট্রপতির শুভ-কামনা

যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতায় স্বাধীনতা সংগ্রাম

আপনাদের "গণশক্তি"র জন্য কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সমস্যা তো দেশের সম্মুখে অনেকই আছে, কিন্তু আজ সমস্যা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলেই সকল সমস্যার প্রথমে প্রস্তাবিত যুক্ত-রাষ্ট্রের সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া উপস্থিত হয়। ভারতের পরাধীনতার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য যুক্ত-রাষ্ট্রের যে পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে তাহাই এখন ভারতের এক ও অদ্বিতীয় প্রশ্ন।

কংগ্রেস সুনিশ্চিতরূপে যুক্ত-রাষ্ট্রের এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। বিদেশী শাসকবর্গ কর্ত্তৃক রচিত কোন শাসনতন্ত্রই ভারতবাসী চাহে না; এইরূপ যে কোন শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিবার জন্য কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদই শুধু ভারতের শাসন-তন্ত্র গঠন করিবে—ইহাই কংগ্রেসের দাবী।

নিখিল বিশ্বের রাজনীতিক পরিস্থিতি আজ আমাদের দেশেও এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতেছে। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতি এতটুকু দুর্ব্বলতাও দেশের স্বাধীনতার প্রতি গভীর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কারণ উহাতে স্বাধীনতাকামী শক্তির অপচয় হইবে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়তা হইবে।

পৃথিবীর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহের পরস্পর-বিরোধিতায় বর্ত্তমানে আমরা এমন অনুকূল অবস্থায় পৌঁছিয়াছি যে সমগ্র জাতি একত্র হইয়া মিলিত কণ্ঠে দাবী জানাইতে পারিলেই আমাদের দাবী সম্পূর্ণ মিলিয়া যাইবে। এ অবস্থায় মুক্তিকামী সমস্ত শক্তির একত্র সমাবেশ ও সংহতি সকলের আগে প্রয়োজন। গণ-মানবের প্রাথমিক দাবীর ভিত্তিতে জনগণকে আমাদের সংগঠিত করিতে হইবে ও যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতি তীব্র বিরোধিতার ভিত্তিতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে।

আশা করি আপনাদের "গণশক্তি" এই জাতীয় সংহতিকে জয়যুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবে। কোনো বিশেষ শ্রেণীর কথা ছাড়াও আশা করি আপনাদের "গণশক্তি" সকল শ্রেণীর ন্যায্য অধিকারের জন্য সংগ্রাম করিবে।

আমার আন্তরিক শুভ-কামনা গ্রহণ করুন।

১৪।৭।৩৮

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

যুদ্ধ বিরোধ

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বার-য়্যাট-ল

পয়লা আগষ্ট তারিখে সমস্ত পৃথিবীতে যুদ্ধবিরোধ দিবস প্রতিপালিত হবে। যুদ্ধবিরোধ আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত আছে বলে তার যথার্থ তাৎপর্য্য আমাদের বিশেষ করে জানা দরকার।

যুদ্ধবিরোধ শুধু নিষ্ক্রিয় শান্তিপ্রিয়তা একেবারেই নয়। শান্তিবিধান আন্দোলনের সঙ্গে তার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাম্রাজ্যতন্ত্রের উচ্ছেদই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিছুকাল ধরে প্রায়ই শোনা গেছে যে শীঘ্রই ১৯১৪-১৮ সালের মত আবার মহাযুদ্ধ বেধে যাবে; মানুষকে মারবার আর যন্ত্রণা দেবার ব্যবস্থা বিজ্ঞানের কল্যাণে আগের চেয়ে এগিয়ে গেছে বলে এবারকার যুদ্ধ আরও ব্যাপক, আরও দারুণ হবে।

ফ্যাশিজম্ আজ সভ্যতার বিরুদ্ধে, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ১৯৩১ সাল থেকে মহাচীনে জাপানের বর্ব্বর অভিযান চলেছে। অ্যাবিসীনিয়া ও স্পেনে ইতালীয় ফ্যাশিজ্‌মের নৃশংস মূর্ত্তি আমরা দেখেছি। মধ্য ইউরোপে ও স্পেনে হিট্‌লারী দলের দম্ভ ও অত্যাচার সকলেই লক্ষ্য করেছেন। ফ্যাশিষ্টরা সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজিদারদলের সাহায্য পেয়ে এসেছে। বিশেষত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের সাধারণ লোকের চোখে ধুলা দেবার জন্য বকধার্ম্মিক সাজবার চেষ্টা করে আসলে ফ্যাশিষ্টদেরই সমর্থন করে চলেছে। নিজেদের মধ্যে বিষম রেষারেষি সত্ত্বেও গণশক্তিকে পঙ্গু করার জন্যই সর্ব্বদেশের ধনিক, সর্ব্বদেশের সাম্রাজ্যবাদী এক্‌কাট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফ্যাশিজ্‌ম্ যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল, যুদ্ধ ফ্যাশিজ্‌মের একটা অঙ্গ। সমস্ত ফ্যাশিষ্ট দেশে যুদ্ধের আয়োজনই হচ্ছে সরকারের প্রধান কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকের মধ্যে যুদ্ধ-মনোবৃত্তি জাগানো হচ্ছে তার প্রধান চেষ্টা। তাই ফ্যাসিজ্‌মের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা দেশে গণশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে। ফ্যাসিষ্টরা এখন আর পূর্ব্বের মত খোলাখুলি যুদ্ধঘোষণা করে লড়াই করতে চায় না। তারা গৃহবিবাদ বাধিয়ে দিয়ে পুঁজিদার-জমিদারের দলকে সাহায্য করে, গণতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করে। জার্ম্মাণী, ইতালী, জাপান ছাড়া পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিষ্টদেরই প্রভুত্ব; ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বন্ধু। সকল সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রগতিবিরোধীরা তাদের সহায়তা করেছে।

কিন্তু আজ পৃথিবীর একষষ্ঠ অংশে সোভিয়েট শাসন সুপ্রতিষ্ঠ রয়েছে; এই হচ্ছে সকল দেশের প্রগতিবিরোধীদের চক্ষুশূল। সমাজতন্ত্রের সাফল্যকে ধনিকবাদ যমের মত ভয় করে বলে সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিষ্পিষ্ট করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। চীনের গণজাগরণকে সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা বিষম ভয় করে বলে ঈর্ষা সত্ত্বেও জাপানকে অন্যান্য সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রতিরোধ করছে না। নানা দেশে চাষীমজুরের দল সাম্যবাদ গ্রহণ করেছে, বিপ্লবের জয় ঘোষণা করেছে দেখে মালিকরা শঙ্কিত হচ্ছে, তাদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ফ্যাসিজ্‌মের সঙ্গে মিতালি করছে। ধনিকবাদ কিছুকাল পূর্ব্বেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন পেয়ে এসেছে; কিন্তু ফ্যাসিজ্‌মে মুমূর্ষু ধনিকবাদের উলঙ্গ রূপ দেখে তাদের অনেকেই আজ সম্মিলিত গণশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্য চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন শ্রমিক কৃষকের সাহায্য নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। মেক্সিকোয় ইংরেজ আর আমেরিকান ধনিক বিপদে পড়েছে। প্যালেষ্টাইনে ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্র ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আফ্রিকার গণশক্তি জেগে উঠেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার সকল পদানত জাতিই আজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

ফ্যাসিজ্‌ম্ আর সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক হচ্ছে যমজ সম্পর্ক; সর্ব্বদেশের মুক্তি আন্দোলন তাই ফ্যাসিষ্টবাদকে প্রত্যাখ্যান করবে, প্রতিরোধ করবে, বিনাশ করবে, ফ্যাসিজ্‌ম্ ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের কবরের উপর নূতন পৃথিবী স্থাপন করবে।

শান্তিবাদীদের মধ্যে অনেকেই চান্ যে ফ্যাসিষ্টদের শান্ত করার জন্য এসিয়া, আফ্রিকার মত "পশ্চাৎপদ' মহাদেশে কয়েকটা উপনিবেশ তাদের দেওয়া উচিত। এ প্রস্তাবকে আমরা ঘৃণাকরি; এরকম প্রস্তাব আমরা কখনও বরদাস্ত করতে পারি না। গরু-ভেড়ার মত আমাদের এক খোঁয়াড় থেকে আর খোঁয়াড়ে সরাবার উদ্যোগকে আমরা কোনমতে সহ্য করতে পারি না। ঘুষ দিয়ে লোলুপ ধনিকদের যারা সন্তুষ্ট করতে চায়, তারা শুধু নির্ব্বোধ নয়, তারা আমাদের মুক্তি আন্দোলনের শত্রু। ঐ জঘন্য উপায়ে যারা যুদ্ধ আট্‌কাতে চায়, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সংস্পর্শ থাকতে পারে না।

অনেকে আবার আছেন যাঁরা মনে করেন যে যখন ধনিকবাদের আমলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী আর সাম্যবাদই যখন যুদ্ধের একমাত্র সমাধান, তখন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধায়োজন সম্বন্ধে আমাদের মাথা না ঘামানোই উচিত। কিন্তু এই মত অনুসারে কাজ করলে সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করা হবে। একথা অবশ্য ঠিক যে ধনিকবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ শেষপর্য্যন্ত কিছুতেই যুদ্ধকে বর্জ্জন করতে পারে না। কিন্তু কোন কোন সময়, কয়েকটী বিশেষ ঘটনার সমাবেশে ধনিকতন্ত্রী দেশেও যুদ্ধবিরোধী মনোভাব থাকে। প্রায় দুবছর আগে ইংলণ্ডে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে ভোট নেওয়া হয়েছিল, তা এই কথার প্রমাণ। সেই যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের সুযোগ আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়। ধনিকবাদকে বাঁচিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার বৃথা চেষ্টা আমরা করতে চাই না বটে; ধনিকবাদ থাকলে যুদ্ধও থাকবে। কিন্তু এখন অন্তত কিছুকালের জন্য যুদ্ধকে আট্‌কানো বিশেষ দরকার, আর তাই ধনিকবাদ দূর করে সাম্যবাদ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই আমরা এখন যুদ্ধকে অন্তত স্থগিত রাখার চেষ্টা করব।

যুদ্ধকে এখন আটকাবার চেষ্টা করার কয়েকটি গুরুতর কারণ আছে। প্রথমত নূতন এক মহাযুদ্ধে শুধু যে বহু লোকের প্রাণ যাবে তা নয়, মানবজাতির সংস্কৃতিও পিছিয়ে যাবে। অবশ্য সাম্যবাদীবিপ্লবের বিজয় আসবেই, কিন্তু তা সুদূর পরাহত হয়ে যাবে, বিপ্লবী সংগ্রাম আরও কঠোর হয়ে পড়বে। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধকে প্রতিহত রেখে গণশক্তিকে জাগ্রত যদি করা যায়, তাহলে আর বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না, গণসাধারণের সহ্য শক্তিকে নিদারুণভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে যুদ্ধকে যতই পেছিয়ে দেওয়া যাবে, ততই সাম্যবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির সময় পাওয়া যাবে। সাম্রাজ্যবাদের শক্তিক্ষয় হবে, ফ্যাসিষ্টদেশে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সম্ভাবনা বাড়বে। যুদ্ধকে আট্‌কে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নে সাম্যবাদ আরও শক্তিমান্ হবে, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার উদ্যোগ সম্পূর্ণ হবে, সমগ্র পৃথিবীতে সাম্যবাদী বিপ্লবের সাফল্য শীঘ্রই সম্ভব হবে। যুদ্ধবিরোধ গণ আন্দোলনকে বিজয়ের পথে অগ্রসর করে দেবে। আর এক কারণ হচ্ছে এই যে যুদ্ধবিরোধ আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিকামী জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা সহজ হবে; যুদ্ধে যাদের কোন স্বার্থ নেই, যুদ্ধ যাদের কাছে কেবল একটা বিকট বিপত্তি বলে মনে হয়, সেই জনসাধারণকে ধনিকবাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বোঝান যাবে।

সম্প্রতি গান্ধীজী বলেছেন যে চীন যদি জাপানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে পূর্ণ অহিংসভাবে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হয়, তাহলে তাদের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসকে বদলে দিতে পারে। তাঁর এ অভিমতে যুদ্ধবিরোধ আন্দোলন সায় দিতে পারে না। ফ্যাসিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করতেই হবে; সেক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা অহিংসার পরাকাষ্ঠা হলেও গণ-

অন্দোলনের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করবে, সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি উৎপাটিত হওয়ার সম্ভবনা থাকবে না।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আমরা কিছুতেই যোগ দিতে পারি না, প্রকারান্তরেও সে যুদ্ধকে সাহায্য আমরা করব না। লোলুপ সাম্রাজ্যবাদীরা মোটা মুনফার লোভে সাধারণ লোকের দুঃখকষ্ট তুচ্ছ করে যুদ্ধে লাগে। তাদের মতলবে সায় দিতে আমরা কোনক্রমেই রাজী হব না। চীন বা স্পেনে যে সংগ্রাম গণশক্তি চালাচ্ছে, তাহচ্ছে স্বাধীনতার সংগ্রাম, সংস্কৃতির সংগ্রাম। যুদ্ধবিরোধের নামে সে সংগ্রামের বিরোধিতা করা ঘোর অন্যায় হবে, আমাদের পক্ষে আত্মঘাতীই হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যারা লড়েছে, তাদের আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করব; তারাই সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করে যুদ্ধের আসল কারণ দূর করবে, ইতিহাসের নূতন অধ্যায় আরম্ভ করবে।

ইংলণ্ডের শ্রমিক নেতা, বিখ্যাত শান্তিবাদী জর্জ ল্যান্সবরি কিছুকাল আগে হিটলার, মুসোলিনি প্রভৃতির কাছে দরবার করতে গেছলেন, তারা যাতে যুদ্ধ থেকে বিরত হয় এই আশায়। তাঁর আশা মরীচিকামাত্র; শান্তি আন্দোলন শান্তির প্রধান শত্রু ফ্যাসিজ্‌ম্‌ ও সাম্রাজ্যবাদের আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকলে সাফল্যের কোন আশা নেই।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশে ফেডারেশন চাপিয়ে কয়েকজন নেতাকে সন্তুষ্ট করে গণআন্দোলনকে দুর্ব্বল করার চেষ্টায় আছে। ধনিকবাদের এমন এক স্তর উপস্থিত হয়েছে যখন গণতন্ত্রের সঙ্গে তার অহিনকুল সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় ধনিকবাদীরা সর্ব্বদেশের গণতন্ত্রকে আর বিশেষত সোভিয়েট শাসনকে বিধ্বস্ত করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। জার্ম্মাণী, জাপান, ইতালীর পেছনে রয়েছে পালের গোদা ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্র।

যুদ্ধবিরোধ আন্দোলন এই জগৎজোড়া ষড়যন্ত্রের কাছে হার মানবে না। সাম্রাজ্যতন্ত্রের স্বার্থসাধনে গণশক্তিকে বলি দেওয়ার যে আয়োজন চলেছে তাকে প্রতিরোধ করতেই হবে, সাম্রাজ্যবাদকে পঙ্গু করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তার

দীনবন্ধু রায়

সংগ্রামের পুরোনো সংজ্ঞা

প্রায় পনরো বছর আগে আমি একজন তদানীন্তন ত্রাসবাদীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মহাশয়, স্বাধীনতা কি করে লাভ হবে?"

ত্রাসবাদী উত্তর দেন, "অবশ্যই সংগ্রামের দ্বারা।"

আমি জিজ্ঞাসা করি, "সংগ্রাম কি করে হবে?"

ত্রাসবাদী উত্তর দেন "সমগ্র জনসাধারণ যখন সংগ্রামমুখী হবে তখন।"

আমি: "সমগ্র জনসাধারণ কি করে সংগ্রামমুখী হবে?"

ত্রাসবাদী: "দুই উপায়ে। এক, সাময়িক প্রভাবে। জগতের ইতিহাসে মাঝে মাঝে একটা সময় আসে, যখন জনসাধারণ স্বভাবতঃই বিপ্লবমুখী হয়ে ওঠে। কিন্তু তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কখনো সংগ্রাম সুরু করে না। জনসাধারণকে সংগ্রামে নিয়োজিত করতে হলে সাময়িক প্রভাব ছাড়া আরো একটি শক্তির প্রয়োজন হয়, সেটা

হচ্ছে নেতৃত্ব। মুষ্টিমেয় বিপ্লবী নেতারা যখন অগ্রণী হয়ে বিপ্লবাত্মক কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাবেন, তখনই জনসাধারণ সংগ্রামে লিপ্ত হবে, এবং স্বাধীনতা আসবে।"

আমি: "কিন্তু শুধু দৃষ্টান্ত দেখালেই জনসাধারণ বিপ্লবীদের নেতৃত্ব মেনে নেবে কি?"

ত্রাসবাদী দৃঢ়স্বরে বল্‌লেন "হ্যাঁ।"

কথাটা তিনি এত দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন যে মনে হয় ঐখানেই ছিল তাঁর যুক্তিতর্কের ফাঁক। কি উপায়ে জনসাধারণের ওপর বিপ্লবী নেতৃত্ব স্থাপিত হবে সে সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

বর্ত্তমান ধারণা

সংগ্রাম সম্বন্ধে এমন একটা সঙ্কীর্ণ ধারণা আজ কারোই নেই, এমন কি পূর্ব্বতন ত্রাসবাদীদেরও নেই।

আমরা আজ বুঝেছি, সংগ্রামের ক্ষেত্র বহুকাল বিস্তৃত। শুধু আকস্মিক দৃষ্টান্তের দ্বারা সংগ্রাম গড়ে তোলা যায় না। আমরা আজ বুঝেছি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা মানে শুধু কয়েকটী নেতা অথবা কর্ম্মী গড়ে তোলা নয়, পরন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে, জাতির নানা শ্রেণীর মধ্যে আত্মচেতনা জাগিয়ে তোলা। আমরা আজ বুঝেছি যে একটা মনগড়া সংগ্রামের আদর্শ দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়াটা বাস্তবিক বৈপ্লবিক আন্দোলন নয়; **বাস্তব আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবের যে সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে সেইটে কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই বাস্তবিক বৈপ্লবিক আন্দোলন।**

এক কথায় বল্‌তে গেলে, বর্ত্তমান বৈপ্লবিক আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে বিস্তার এবং ব্যাপকতার দিকে, বাস্তবের দিকে, জনসাধারণের দিকে।

কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে কংগ্রেসের ৩১ লক্ষ সভ্যসংখ্যা দেখেই মার্ক্সবাদী কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বাস্তবিক যখন মার্ক্সবাদীরা দ্বিতীয়বার কংগ্রেসে যোগদান করা স্থির করে (১৯৩৫ সালে) তখন কংগ্রেসী আন্দোলনের বিস্তার অতি সামান্যই ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব ইতিহাস থেকে মার্ক্সবাদী এই শিক্ষা গ্রহণ করে যে দেশের সমস্ত সঙ্ঘ থেকে যদি স্বাধীনতার ডাক আসে তবে সবচাইতে বেশী লোক আসবে কংগ্রেসের পতাকার তলায়। **এই সম্ভাবনা কংগ্রেসের মধ্যে নিহিত থাকাতেই মার্ক্সবাদী সর্ব্বতোভাবে কংগ্রেসের সহযোগিতা সুরু করে,** এবং অনেকাংশে এই মার্ক্সবাদীরই চেষ্টায় (কংগ্রেস-সোশ্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট এবং জওয়াহির লাল) কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত হয়।

শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করবার যে আদর্শ নিয়ে মার্ক্সবাদী ১৯২৫ সালে আন্দোলন সুরু করেছিল, সেটা সফল হয়েছে বল্‌তে হবে। অতএব মার্ক্সবাদীকে আরো একধাপ এগিয়ে যেতে হবে। এখন মার্ক্সবাদীর প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে কংগ্রেসের বৈপ্লবিক ভিত্তিটাকে পাকা করে গাঁথা।

সোশ্যালিষ্টদের নতুন কর্ম্মপন্থা দেখে হয়তো অনেকের মনে সন্দেহ থাকতে পারে যে বোধ হয় এ যুগে শ্রেণী-সংগ্রামের ওপর আমরা তেমন ঝোঁক দিচ্ছি না, শুধু স্বাধীনতা-সংগ্রামটাই বুঝি আমাদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, যাঁদের এই ধারণা তাঁরা সোশ্যালিষ্টদের নতুন কর্ম্মপন্থার অ আ ক খ ও বোঝেন নি।

শ্রেণী সংগ্রামের দিকে যদি আমরা ঝোঁক না দিই, তবে স্বাধীনতা আন্দোলন যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাবে। শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রেই শ্রমিকের আত্মচেতনা জাগে, শ্রেণী-সংগ্রামেই শ্রমিক তার শক্তির পরিচয় পায়। যে শ্রমিক শ্রেণী-সংগ্রামের আগুনে পুড়েছে সে পাকা লোহার মত শক্ত। এবং সেই শ্রমিক যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে এগিয়ে আসে তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তি সহস্রগুণে বেড়ে যায়। অপর পক্ষে,

যে- শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রামের পথ এড়িয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে এসে যোগ দেয় সে শুধুই একটি ব্যক্তি, তার পিছনে কোনো শক্তিশালী শ্রেণীসঙ্ঘও নেই, তার নিজেরও সংগ্রামের কোন অভিজ্ঞতা নেই। সে না এলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায় বিষ্ণুপুরে বলেছেন যে শ্রমিক স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ না দিলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। রায় মহাশয়ের শ্রমিকের আদর্শ অনুসারে কথাটা ঠিক। রায় মহাশয় শ্রমিক বলতে বোঝেন শ্রমিকদের সবচাইতে নীচু স্তরটি, যাদের রাষ্ট্রনীতিক চেতনা তো দূরে থাক্ শ্রেণী চেতনাও জাগে নি। আমরা কম্যুনিষ্টরা শ্রমিক বলতে বুঝি সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে, তার মধ্যে শুধুই রায়ের আদর্শ শ্রমিক নেই, রাষ্ট্রবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রমিকও আছে, সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামরত শ্রমিকও আছে। আমাদের লক্ষ্য যাতে শ্রমিক শ্রেণী স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয় এইরকম শ্রমিকের নেতৃত্বে।

রায় মহাশয় বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলেন, ওসব হল আদর্শবাদের বুলি। শ্রমিক আজই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হয়ে উঠতে পারে না।

আমরা কি কোথাও বলেছি যে আজই শ্রমিক স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হয়ে উঠতে পারে? কোথাও নয়। আমরা বলি, স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তি হতে পারে শুধু শ্রমিক-নেতৃত্বে। সেই জন্যই আমরা চাই যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে এই নেতৃত্ব গড়ে তুলতে।

শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নেতৃত্বের যে সম্ভাবনা আছে সেটা পরিস্ফুট করে তোলবার প্রচেষ্টা এক জিনিষ, আর আজই শ্রমিক নেতা হয়ে উঠতে পারে এ বুলি হলো আরেক জিনিষ। কিন্তু শ্রীযুক্ত রায়ের চোখে দুইই এক। দার্শনিকের দৃষ্টি বটে।

আশঙ্করি কাণপুর ধর্ম্মঘটের উদাহরণের ফলে শ্রীযুক্ত রায়ের ব্যঙ্গস্পৃহা খানিকটা প্রশমিত হয়েছে। কম্যুনিষ্টদের প্রচেষ্টার ফলে কাণপুরের শ্রমিকদের এতখানি ক্ষমতা জন্মেছে যে কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্টের পক্ষ নিয়ে অগ্রণী হয়ে তারা কংগ্রেস বিদ্বেষী মিলমালিকদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে। শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট না করলে যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের যে অপমান সহ্য করা ছাড়া আর গতি ছিল না এসম্বন্ধেও কারো কোনো সন্দেহ আছে কি? অতএব শ্রমিক-নেতৃত্বের সম্ভাবনাটা নেহাত আদর্শবাদ নয়। এবং রায় মাফিক্ চোখ কান বুজে ভবিষ্যতের সম্ভবনাটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করাটাও বাস্তববাদ নয়।

কাণপুরের ইতিহাস প্রত্যেক মার্ক্সবাদীর তন্ন তন্ন করে খুটীয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন একটা ব্যাপার আর ঘটেনি। রায় মহাশয় শ্রমিক নেতৃত্বকে আদর্শবাদীর স্বপ্নবিলাস আখ্যা দিয়েছেন কিন্তু ষ্টেট্স্ম্যান কানপুরের ব্যাপারকে Worker's lead—অর্থাৎ শ্রমিককেই আন্দোলনের পরিচালক আখ্যা দিয়েছে।

কানপুর কংগ্রেসের মধ্যে শ্রমিকের প্রভাব সুস্পষ্ট। ফলে, কানপুর কংগ্রেস কমিটি বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কানপুর কংগ্রেসের কথার সুরে কোথাও আপোষ-রফার চিহ্ন নেই, ঠিক শ্রমিকেরই মত তার কথার সুর—যতক্ষণ জয়লাভ না হচ্ছে ততক্ষণ প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম চালাতে হবে।

মুসলীম লীগ এবং কংগ্রেসের পাশাপাশি একই আন্দোলনে যোগদান বর্ত্তমান কালে আমরা কোথাও দেখতে পাই নি। কিন্তু কানপুরে তা সম্ভব হয়েছে। শ্রমিকের প্রতাপেই এ সম্ভব হয়েছে।

যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটিও কানপুরের সংগ্রামে প্রভাবান্বিত হয়েছে। আজ বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেসের তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে যুক্তপ্রদেশের সংগ্রাম স্পৃহা কত বেশী।

এমনকি যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টেরও হাবভাব অনেকটা বদলেছে। কানপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত মিলমালিকদের "মজুরদের মধ্যে কম্যুনিজম বিস্তার হচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে হল্লা না করে নিজের চরকায় তেল দাও" এরকম ভাবে বলবার সাহস যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের জন্মাতো না, যদি প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রমিক মিলমালিকদের সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান না করতো।

এই হলো শ্রমিক-নেতৃত্বের প্রকাশ, শ্রমিক-নেতৃত্বের বিকাশ।

শ্রমিক প্রচেষ্টার ফলে যুক্তপ্রদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যেমন বিস্তার বেড়েছে, তেম্নি বেড়েছে তার শক্তি।

বাংলা দেশ

আমাদের বাংলা দেশেও কি কানপুরের মত শ্রমিক নেই?

যাঁদের এই ধারণা তাঁদের একবার আমরা ডক এবং চট্কল অঞ্চল ঘুরে আস্তে বলি, তাঁদের বিজলী মজদুর এবং জাহাজীদের মিটিং দেখতে বলি।

কানপুরের সঙ্গে তফাৎ আমাদের এই, যে সেখানে মার্ক্সবাদীরা দিনের পর দিন রাতের পর রাত অবিশ্রান্ত খেটে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। আমরা আমাদের শক্তিটা নানা দিকে ছড়িয়ে দিয়েছি। ফলে, শ্রমিকদের সঙ্ঘগুলি অতটা বিস্তৃত, অতটা একতাবদ্ধ হতে পারে নি।

কাণপুরে শ্রমিক-আন্দোলনের নেতারা আন্দোলনটাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি—কাণপুরের সব শ্রমিক, চামড়ার কারখানারই হোক কি সূতাকলেরই হোক একই আন্দোলনের অংশীদার। বাংলা দেশে আন্দোলন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ। বিজলী মজদুরদের ধর্ম্মঘট আসন্ন অথচ আমরা চটকলের মজুরদের সে কথা জানাই না। এমন কি এক মিলে ধর্ম্মঘট হলে অন্যমিলের শ্রমিকদের জানানো হয় না। সম্প্রতি রিলায়্যান্স চটকলে একটা ধর্ম্মঘট হয়ে গেল—শুধু রিলায়্যান্স অঞ্চল ছাড়া অন্য কোনো অঞ্চলকে সে ধর্ম্মঘটে সাহায্য করতে বলা হলো না। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিকে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হল না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাছে শ্রমিকদের কোনো প্রতিনিধি পাঠানো হল না। ধর্ম্মঘটীদের মধ্যে যথেষ্ট মুসলমান থাকা সত্ত্বেও কোনো মুসলমান সঙ্ঘের সাহায্য চাওয়া হল না। অতএব ধর্ম্মঘটের ফলে কি স্বাধীনতা আন্দোলন কি শ্রমিক আন্দোলন কোনটারই বিস্তার অথবা শক্তিবৃদ্ধি হলো না।

কাণপুর আমাদের চোখ ফুটিয়েছে। কাণপুরের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দেখ্ছি যে **স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তার এবং শক্তিবৃদ্ধির একটা অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ শ্রেণী সংগ্রামকে সুসংবদ্ধ করা, শক্তিশালী করা এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামটাকে জাতীয় সংগ্রামের বৃহত্তর ক্ষেত্রে টেনে আনা।**

এর মানে কি এই যে শ্রেণী সংগ্রামই ক্রমে "স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত" হবে?

না, না, না। বারবার **আমাদের বলতে হবে,** বোঝাতে হবে যে শ্রেণী-সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম দুটোই এক সঙ্গে চল্বে, শুধু এমনভাবে দুটোকে চালাতে হবে যাতে একের বিস্তারে অন্যেরও বিস্তার হবে, একের শক্তিবৃদ্ধি হলে অন্যেরও শক্তিবৃদ্ধি হবে। স্বাধীনতা আন্দোলন এবং শ্রেণী সংগ্রাম গাড়ী এবং ঘোড়া নয়, পরন্তু জুড়ী ঘোড়া। যদি দুটী আন্দোলন একসঙ্গে চলে তবেই গতিটা ফলপ্রদ হবে, অন্যথা নয়।

শ্রেণী সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রাম ক্ষেত্রে টেনে আন্লেই সেটা স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়ে পড়ে না। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের সংস্পর্শে এলে শ্রমিক স্বাধীনতা আন্দোলনের বাস্তব প্রয়োজন বুঝতে পারে, যেটা তার নিজের শ্রেণীগত সংগ্রামে অত স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। তেমনি শ্রেণীসংগ্রামের সংস্পর্শে এলে পরে স্বাধীনতা আন্দোলনও একটা শক্তিশালী সংগ্রামরত শ্রেণীর আবহাওয়ায় থেকে সমৃদ্ধ হয়, শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

আগেই বলেছি মার্ক্সবাদীর আজ কর্ত্তব্য কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্যে বৈপ্লবিক ভিত্তিটা পাকা করে গাঁথা।

কানপুর দেখিয়েছে তার পন্থা। শ্রেণী-সংগ্রাম বর্জ্জন কর্‌লে স্বাধীনতা আন্দোলন নির্জ্জীব হয়ে পড়ে। শ্রেণী-সংগ্রাম মার্ক্সবাদীর নেতৃত্বে শক্তিশালী করে তুল্‌লে স্বাধীনতা আন্দোলনও সেই অনুপাতে বিস্তার লাভ করে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শ্রেণী-সংগ্রাম আরও তীক্ষ্ণ, আরও সুসংবদ্ধ, আরও বিস্তৃত করে তুল্‌তে হবে। শ্রেণীসংগ্রামকে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ্‌লে চল্‌বে না। সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে একই গ্রন্থিতে বাঁধতে হবে। যেখানেই শ্রমিক আন্দোলনকে বিস্তার করে জাতীয় সংগ্রাম ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানেই সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুল্‌তে হবে। যেখানেই শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য থেকে শ্রমিক নেতা গড়ে তোলবার সম্ভাবনা আছে, প্রাণপণ চেষ্টায় সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুল্‌তে হবে। মনে রাখ্‌তে হবে মার্ক্সবাদের মূল ভিত্তি শ্রমিকের উপর, মার্ক্সবাদ শ্রমিক শ্রেণীর নীতি। শ্রমিককে সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে স্থাপন করাই মার্ক্সবাদীর প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রমিককে অবহেলা করে মার্ক্সবাদীর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া আর যাই হোক মার্ক্সবাদ নয়।

শ্রেণীসংগ্রামই বিপ্লবী নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তার এবং শক্তিলাভের চাবিকাঠি।

ভবিষ্যদ্বাণী

অরুণ মিত্র

মহাযুদ্ধের সময়......
হিসারের ভাঙ্গা গম্বুজ আর ভাঙ্গা
প্রাসাদের পাশ দিয়ে
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলাম আমি
(সূর্য্যের কী দাহ সেদিন ঃ
মাটিতে কুয়াসার অস্পষ্টতা)।
পা আর চল্‌ছিল না যেন
(শত্রু সৈন্যের দৃষ্টি থেকে পালিয়ে
ফির্‌ছিলাম);
চারদিকে ধান ক্ষেতের জলে পূতিগন্ধ
(এখানে ওখানে শবের ছড়াছড়ি)।
ভাঙ্গা এক ঘরের মধ্যে থেকে
বেরুলেন আমার প্রাচীন গুরু
আমার শৈশব দিনের পথ-প্রদর্শক
মোল্লা, যিনি পাণ্ডিত্যের অবতার···
বল্লেন আমায় ডেকে
" শোন আমার ভবিষ্যদ্বাণী ;
অনাগত ভবিষ্যতে আমার কথা
আস্‌বে তোমার স্মরণে।"

এসেছে সেই ভবিষ্যৎ······
তোমার কথা স্মরণ করি, হে শিক্ষক।
তুমি বলেছিলে, "রাজমুকুট পড়্‌বে না খসে'।"
পড়েছে খসে' রাজমুকুট।
তুমি বলেছিলে, "সিংহাসন ভাঙবেনা
কখনও।"
ভেঙেছে সিংহাসন।
তুমি বলেছিলে, "আমাদের মেয়েদের
গুণ্ঠন খুল্‌বে না জেনো।"
খুলেছে তাদের গুণ্ঠন।
তুমি বলেছিলে, "আমাদের দেশ থেকে
পালাবে না ওরা
ওই মোল্লা, খাঁ আর কাজির দল।"
পালিয়েছে তারা সব।
মোল্লা, হে শিক্ষক,
কোথায় তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ?
মোল্লা, হে শিক্ষক,
তোমার কথা ভাব্‌লে আমার
ক্লান্তি আসে।

[তাজিকিস্থানের কৃষক কবি মুনাভার শোর একটী কবিতার অনুবাদ। আমাদের দেশে সিভিল লিবার্টির সঙ্কোচের জন্য কয়েকটী লাইন বাদ দিতে হয়েছে।—সম্পাদক]।

জগতের সর্ব্বহারা শ্রেণীর ঐক্যই এই মুহূর্ত্তের দাবী

ডিমিট্রভ

সমগ্র মানব জাতির মারাত্মক শত্রু ফ্যাসিজম্‌-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে অভিযান সুরু করাই আজ সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীপ্রতিষ্ঠানের আশু এবং সর্ব্বপ্রধান কাজ।

এ কাজ খুবই কঠিন এবং খুবই বিরাট ; ইহা শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ কাজের সীমা ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু এই কাজ যদি নিষ্পন্ন করা যায় তাহা হইলে রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহে আমূল পরিবর্ত্তন আসিবে, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে উহার গতি ফিরিয়া যাইবে এবং শ্রমিক শ্রেণীর ও তাহাদের প্রতিষ্ঠান এমন এক শক্তিতে পরিণত হইবে যে শক্তি শুধু স্বদেশের জন সাধারণ নয় সমগ্র মানব জাতির ভাগ্যকে অসাধারণভাবে প্রভাবিত করিবে।

ঐক্য সাধনের চারটি প্রাথমিক সর্ত্ত

এই অসাধারণ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিষ্পন্ন করিবার পক্ষে প্রথমে প্রয়োজন কি ?

প্রথমত, প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে, ধনিক শ্রেণীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল দলের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত করার আবশ্যকতা শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদের নীতি নির্দ্ধারণের সময় শ্রমিক শ্রেণী প্রতিষ্ঠান-গুলিকে **নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষাকেই** প্রথম ও প্রধান বিষয় বলিয়া ধরিতে হইবে, বুর্জ্জোয়া স্বার্থ লাভবান হয় এমন ভাবে তাহাদের কাজ করিলে চলিবে না! নিজেদের শ্রেণী সার্থকে প্রথম স্থান দেওয়ার ফলে শ্রমিক শ্রেণী ও তাহাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ সমস্ত শোষিতদের, সমস্ত জন সাধারণের স্বার্থকেই রক্ষা করিবে। শোষিত ও শোষকের স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানের নীতি খতম করিয়া দিতে হইবে। একই সঙ্গে কেহ বিত্তশালী ধনিকদের পক্ষে এবং শ্রমজীবি জন সাধারণের পক্ষে থাকিতে পারে না। কথায় যেমন বলে, ভগবান ও কাঞ্চনের পূজা এক সঙ্গে চলিতে পারে না। একই সঙ্গে সেকালের বিদ্রোহী সেনাপতিগণের এবং স্পেনীয় জন সাধারণের পক্ষ সমর্থন করা যায় না। স্পেনীয় ও চীনা জন সাধারণের জয় কামনা করা এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সহিত আপোষের চেষ্টা করা এক সঙ্গে চলিতে পারে না। মুখে স্পেনীয় বা চীনা গণতন্ত্রকে সহানুভূতি দেখাইব অথচ কাজে বৃটিশ রক্ষণশীলদের মনস্তুষ্টির জন্য ঐ গণতন্ত্রকে আত্ম রক্ষার উপায় হইতে বঞ্চিত করিব, এ দুই জিনিষ এক সঙ্গে চলে না। ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে লড়িতে রাজী আছি বলিব, অথচ ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বরদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তম যোদ্ধা কমিউনিষ্টদের পিছনে 'ফেউ' লাগিয়া থাকিব—একই সঙ্গে এরূপ চলে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক আন্দোলনের কর্ম্মীদের মধ্যে ইউ-নাইটেড ফ্রণ্টএর যাহারা শত্রুতা করে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে হইবে। শ্রমিক সাধারণ ঐক্যবদ্ধ কার্য্যের জন্য উদগ্রীব, কিন্তু "কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের" প্রতি তাহাদের মনোভাব সমালোচনামুখী নয় বলিয়া এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা থাকায় শ্রমিকরা যে সকল নেতা অসৎ কৌশল দ্বারা ইউনাইটেড ফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতেছে তাহাদের প্রায়ই বিরোধিতা করিতে পারে না। এই সকল নেতা শ্রমিক শ্রেণীর সমগ্র ও চূড়ান্ত ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিতে রাজী ন'ন, তাঁহারা বুর্জ্জোয়াদের স্বার্থসিদ্ধি করাই বেশী পছন্দ করেন এবং নিজের উন্নতিকেই সকলের উপরে স্থান দেন ; এই কারণে প্রত্যেক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের নিজের মধ্যেই যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করা এবং সর্ব্ব প্রকার বাধা সত্বেও তাহার ঐক্যের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করা প্রাথমিক কর্ত্তব্য।

তৃতীয়ত, যাহারা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অভিযান চালাইতেছে তাহাদিগকে নিরুত্তর করিয়া দেওয়া। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযানের অর্থ সোশ্যালিজম্ এর বিরুদ্ধে অভিযান, যে সোশ্যালিজম্ পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মসূচীতে শ্রমিকগণের মহৎ লক্ষ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযানের অর্থ মানব-ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণীর মহত্তম জয়ের বিরুদ্ধে অভিযান্ যে জয়ের ফলে সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বহারা শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণের শক্তি বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান কাসিষ্টদের কুচক্রান্তের একটা প্রধান অঙ্গ। কাসিষ্টদের চক্রান্তের উদ্দেশ্য হইতেছে সর্ব্বহারা শ্রেণীকে পৃথক পৃথক ভাবে যাহাতে আক্রমণ করা যায় এবং শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করিয়া ধন তান্ত্রিক দেশে শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরীর অধীনে আনা যায় তজ্জন্য আন্তর্জ্জাতিক সর্ব্বহারা শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। ফ্যাসিজম্-এর শত্রু হইব, অথচ আন্তর্জ্জাতিক ফ্যাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা সেভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইব—এই দুই ভূমিকা এক সঙ্গে চলে না। সোশ্যালিজম্ এবং সমগ্র জনসাধারণের প্রকৃত গণতন্ত্রের দেশ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে যে দৃঢ় ভাবে এবং পরিপূর্ণ ভাবে সমর্থন না করে সে সোশ্যালিষ্ট, এমন কি অকপট গণতন্ত্রীও হইতে পারে না। সোভিয়েটের প্রতি মনোভাবই হইতেছে কষ্টিপাথর; ইহার দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি শ্রমিক আন্দোলনের অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানও প্রত্যেকটি ব্যক্তির অনুরক্তি এবং সোশ্যালিজম্ এর প্রতি তাহাদের বিশ্বস্ততার যাচাই হয়।

চতুর্থত, ফ্যাসিজম্ এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানর সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিষ্টদের ট্রট্স্কিপন্থী এজেন্টগণকে নিষ্করুণ ভাবে উচ্ছেদ করিতে হইবে; এই সকল ট্রট্স্কিপন্থী এজেন্ট জার্ম্মাণ ফ্যাসিজম্ এবং জাপানী সমর কর্ত্তাদের নিযুক্ত গুপ্তচর সন্ত্রাসবাদী ও পুলিশ প্রোভকেটরের দল ছাড়া আর কিছু নয়। ফ্যাসিষ্ট গোয়েন্দা বিভাগের ইঙ্গিতে এই সব ট্রট্স্কিপন্থী জীবরা সোশ্যালিষ্ট ভূমির বিরুদ্ধে ধ্বংসকর কর্ম্ম প্রচেষ্টা চালাইতেছে, শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ গভীরতর করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছে এবং ভিতর হইতে পিপলস্ ফ্রন্ট আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সর্ব্বত্রই তাহারা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ধ্বংস করিবার মত কাজ করিতেছে এবং ফ্যাসিজম্ এর বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছে। ফ্যাসিজম্ এর ট্রাট্স্কিপন্থী এজেন্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না চালাইলে ফ্যাসিজম্ এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য কল্পনার অতীত।

ঐক্যের শত্রুদের পরাজিত কর

ফ্যাসিজ্‌ম্ এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য সাধনের পক্ষে আবশ্যক প্রাথমিক সর্ত্তগুলি এই। কিন্তু যে সকল নেতা সেকেণ্ড ও আমষ্টার্ডাম ইণ্টারন্যাশানাল-এর নীতি নির্দ্ধারণের কর্ত্তা তাঁহাদের কর্ম্ম প্রচেষ্টাই এই সব প্রাথমিক সর্ত্তের বিরুদ্ধে যায়। স্পেণীয় জনসাধারণের রক্ষার জন্য সংযুক্ত কর্ম্ম প্রচেষ্টা সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টি সমূহ এবং কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানাল যে সব প্রস্তাব করেন ইঁহারা সে সব প্রস্তাব তো অগ্রাহ্য করেনই, উপরন্তু সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশানাল-এর অন্তর্ভুক্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে এবং স্পেনে জার্ম্মাণ ও ইতালীর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টদের সহিত সংযুক্তভাবে কাজ করে তাহাদিগকেও ইঁহারা দমন করেন। স্পেণীয় জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি এই নিষ্করুণ ঔদাসীন্যের অটল প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য সেকেণ্ড ও আমষ্টার্ডাম ইণ্টারন্যাশনাল-এর লণ্ডন সম্মেলনে স্পেণের সোশ্যালিষ্ট পার্টি ও জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বৃথাই চেষ্টা করে। শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংযুক্ত কর্ম্ম প্রচেষ্টার দ্বারা তাহাদের সংগ্রামে সাহায্যের জন্য ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠান বৃথাই উক্ত ইণ্টারন্যাশানাল-এর নিকট আবেদন জানায়। স্পেণীয় প্রতিষ্ঠানগণ উক্ত ইণ্টারন্যাশানাল দ্বয়ের প্রতিনিধি

আস্থা হারাইয়া সম্মেলন পরিত্যাগ করেন। লণ্ডন সম্মেলনে উভয় ইণ্টারন্যাশনাল এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই যাহা বৃটিশ রক্ষণশীলগণের নিকট গ্রহণ যোগ্য নয়।

এই দুই ইণ্টারন্যাশনাল-এর মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের যে সকল শত্রু আছে তাহারা অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা শুধু যে স্পেনের জনসাধারণের প্রতি চূড়ান্ত ও সর্ব্বাঙ্গীন সমর্থন নষ্ট করিয়া দেন তাহাই নয়, তাঁহারা আরও সব অদ্ভুত কাজ করেন। স্পেনে পিপলস্ ফ্রণ্টকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, ষড়যন্ত্র করিতেছেন, অবিশ্বাস সৃষ্টি করিতেছেন এবং সোশ্যালিষ্ট নেতাগণকে কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতেছেন; এবং এইভাবে পিপলস্ ফ্রণ্ট-এর প্রভাব ও স্পেনীয় গণতন্ত্রের আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করিতেছেন। উপরন্তু, তাঁহারা ফ্রান্সের সোশ্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেও মনোমালিন্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। ফরাসী শ্রমিকশ্রেণী সংযুক্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা কায়েম করিয়াছে এবং পিপলস্ ফ্রণ্ট-এর ভিত্তিতে ফ্যাসিজম্-কে হটাইয়া দিয়াছে; তাহাদের এই দৃষ্টান্ত সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মনে সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু এই সময় ঐ দুই ইণ্টারন্যাশনাল-এর ঐ সব প্রতিক্রিয়াশীল নেতা সোশ্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে, পিপলস্ ফ্রণ্টকে পর্য্যুদস্ত করিবার উদ্দেশ্যে এবং কমিউনিষ্ট পার্টি ও পিপলস্ ফ্রণ্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে বুর্জ্জোয়া সোশ্যালিষ্ট পার্টির এক সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে নানারকম চক্রান্ত জাল রচনা করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে তাঁহারা বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল দলের স্বার্থের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। এই সকল নেতার নিকট প্রধান শত্রু ফ্যাসিজম্ নয়, কমিউনিজম্। সিট্রিন, বেভিন অ্যাডলার প্রমুখ নেতার নিকট ফ্রাঙ্কো প্রধান শত্রু নয়, প্রধান শত্রু হইতেছেন স্পেনীয় জনসাধারণের আদর্শস্থানীয় নেত্রী ডোলোরেস ইবারুরি; ইহাদের নিকট হিটলার ও মুসোলিনি প্রধান শত্রু নয়, প্রধান শত্রু থোরেজ ও থায়েলমান।

ভেদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

আবেদন নিবেদন দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের সাহায্য চাহিয়া বা তাহাদের বুঝাইয়া শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য আনা যাইবে, এ কথা মনে করা মূর্খতা। ঐক্যের প্রকাশ্য ও গোপন শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যকামী সকলের দৃঢ় সংগ্রাম ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

অনেক সময় সোশ্যালিষ্টদের মধ্যে এই চীৎকার শোনা যায় যে, কমিউনিষ্টরা সোশ্যালিষ্ট ও আমষ্টার্ডাম ইণ্টারন্যাশনল এর নেতাদের আচরণের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট সমালোচনা করিয়া ইউনাইটেড ফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠা কঠিন করিয়া তোলে। কিন্তু যাহারা সর্ব্বপ্রকারে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গঠনে বাধা দেয় তাহাদের কঠোর সমালোচনা না করিলে ইউনাইডে ফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠা কি করিয়া সম্ভব হইবে? যে প্রশ্ন সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সে প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা যদি প্রকাশ্যে সমগ্র সত্য ব্যক্ত করিয়া না বলিব তাহা হইলে আমরা শ্রমিক আন্দোলনের কর্ম্মীর নিজেদের কি পরিচয় দিব?

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের ক্ষতিকর কার্য্যকলাপ যে ঢাকা দিবার চেষ্টা করে বা ঐ সম্বন্ধে নীরব থাকে সে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের প্রতি উদাসীন। যে লোক সংযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর ফ্রণ্টের স্বার্থ রক্ষার কল্পনায় সংযুক্ত ফ্রণ্টের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্ষান্ত দেয় কিংবা যে সংস্কারবাদ শ্রমিক আন্দোলনকে বুর্জ্জোয়া স্বার্থের অনুগামী করে সেই সংস্কারবাদের সমালোচনায় বিরত হয় সে লোক শ্রমিক শ্রেণীর কোনই উপকার করে না।

কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল-এর সপ্তম কংগ্রেস শ্রমিক শ্রেণীর এবং জনসাধারণের সংযুক্ত ফ্রণ্টের নীতি ঘোষণা-কালে বিশেষ ভাবে বলেন:—

"সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত একযোগে কাজ করার অর্থ এই নয় যে, তাহাদের কার্য্যের সমালোচনা করা চলিবে না। বরং সে ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের যুক্তিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা করা, সোশ্যাল ডেমক্র্যাসির মতবাদ ও কার্য্যক্রম যে বুর্জ্জোয়াদের সহিত 'সহযোগিতামূলক তাহা প্রকাশ করা এবং সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির সাধারণ কর্ম্মীদের নিকট ধৈর্য্য সহকারে কমিউনিষ্ট মতবাদ ও কার্য্যক্রম বিশ্লেষণ করা অধিকতর প্রয়োজন।"

যে লোক সপ্তম কংগ্রেসের এই নির্দ্দেশ পালন করে না সে শ্রমিক শ্রেণীর ও জনসাধারণের ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজের যোগ্য নহে। যে হেতু পিপলস্ ফ্রন্ট গঠিত হইয়াছে সেই হেতু শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর মতবাদের বিরুদ্ধে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মূল স্বার্থ ও নীতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সংগ্রামের আর প্রয়োজন নাই, একথা যে ভাবে সে অত্যন্ত ভ্রান্ত। এইরূপ সংগ্রাম দ্বারা সংযুক্ত ফ্রন্টের কোনি ক্ষতি হইবে না, বরং লাভই হইবে। উপরন্তু, ফ্যাসিজম্ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংযুক্ত পিপলস্ ফ্রন্টের অভিযানকে দৃঢ় ও বিস্তৃত করিতে হইলে এরূপ সংগ্রাম একান্ত প্রয়োজন।

এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, সংযুক্ত পিপ্‌লস্ ফ্রন্টের অর্থ নীতিহীন কোন একটা সম্মিলিত সঙ্ঘ নয়; নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত পন্থাই কমিউনিষ্টরা অনুসরণ করিতেছে, এবং এই পন্থা হইতে বিচ্যুত না হইয়া তাহারা সংযুক্ত পিপ্‌লস্ ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইতেছে।

আমরা যখন ফ্যাসিজম্ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালাই তখন প্রলেটারিয়ান বিপ্লবী হিসাবেই সংগ্রাম চালাই, বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রী ও সংস্কারবাদী হিসাবে নয়। যেখানে আমরা আমাদের দেশবাসীর জাতীয় স্বার্থ এবং তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অগ্রসর হই সেখানে আমরা জাতীয়তাবাদী বা বুর্জ্জোয়া দেশ প্রেমিক বলিয়া যাই না; আমরা প্রলেটারিয়ান বিপ্লবী হিসাবে এবং আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসাবে ঐরূপ করি। আমরা যে ক্ষেত্রে ফ্যাসিষ্ট পীড়নের বিরুদ্ধে ধর্ম্মগত স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রসর হই সে ক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম-সংস্কারমুক্ত মার্কসীয় মতবাদ আমরা বিসর্জ্জন দিই না।

কমিউনিষ্টরা যখন যুদ্ধ ও ফ্যাসিজম্‌এর বিরুদ্ধে পিপলস্ ফ্রন্ট নীতি অনুসরণ করে, শ্রমজীবি জন সাধারণের অন্যান্য দল ও প্রতিষ্ঠানের সহিত এক যোগে এক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে, এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার, শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালায় তখন তাহারা একথা কখনই ভুলিয়া যায় না যে, বিপ্লবের দ্বারাই ধনিকতন্ত্রে পতন ঘটাইতে হইবে। ধনিক তন্ত্রের কাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; উহার স্থলে সোশ্যালিজম্ এখন শ্রমিক শ্রেণী ও সমগ্র মানব জাতির মুক্তি আনিবে, আর সোশ্যালিজম্ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে কমিউনিষ্টরা কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত হয় না।

মার্কস্‌বাদ প্রচার করা, শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রনী কর্ম্মীদের (Cadres) জ্ঞান বৃদ্ধি করা, কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মার্কস্ এঙ্গেল্‌স্, লেনিন ও ষ্টালিনের শিক্ষাকে আয়ত্ত করা —এই সব কাজের সঙ্গে ঠিক মত কি করিয়া পিপলস্ ফ্রন্টের নীতি অনুসরণ করিতে হইবে তাহা আমাদিগকে শিখিতে হইবে এবং আমাদের অগ্রনী কর্ম্মীগণকে ও জন সাধারণকে দিনের পর দিন শিখাইতে হইবে। খুঁটি নাটি বিষয়ের জন্য আসল জিনিষকে দেখা যাইবে না, এমন অবস্থা আমরা সৃষ্টি হইতে দিব না। মতবাদকে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দিব না; অদ্যকার আশু কর্ত্তব্য সাধন এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও পরিপ্রেক্ষণা—এ দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হইতে দিব না। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, পিপলস্ ফ্রন্ট আন্দোলন যতই বিস্তৃত হইবে এবং এই আন্দোলনের কর্ম্ম কৌশল (tactical) সমস্যা যতই জটিল হইবে ততই অবস্থার এবং বিরোধী শক্তি সমূহের সম্পর্কের খাঁটি মর্কেসীয় বিশ্লেষণ বেশী প্রয়োজন হইবে, ততই মার্কসীয়

লেনিনীয় মতবাদের কম্পাসের কাঁটার উপর বেশী নির্ভর করিতে হইবে।

পিপল্‌স্ ফ্রন্টের পিছনে চালনী শক্তি —সর্ব্বহারা শ্রেণী

জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই ফ্যাসিজম্‌এর বিরুদ্ধে সংযুক্ত পিপল্‌স্ ফ্রন্ট দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করার কাজে সর্ব্বহারা শ্রেণীই হইতেছে দৃঢ়তম যোদ্ধা। সর্ব্বহারা শ্রেণী ছাড়া পিপল্‌স্ ফ্রন্ট একেবারে অসম্ভব। ফ্যাসিজম্ বিরোধী যে কোন গণ আন্দোলনের, গণতন্ত্র ও শান্তি রক্ষার জন্য যে কোন গণ আন্দোলনের প্রধান চালনী শক্তি হইতেছে সর্ব্বহারা শ্রেণী। সর্ব্বহারা শ্রেণী এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জ্জোয়া শ্রেণী, কৃষক ও বুদ্ধি জীবিদের সহিত এক যোগে লড়ে। কিন্তু সর্ব্বহারা শ্রেণীকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে নিজের শক্তির উপর, প্রত্যেক দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যের উপর এবং আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যের উপর। কারণ সর্ব্বহারা শ্রেণী যতই ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হইবে, ততই সে তাহার শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করিতে বেশী সক্ষম হইবে, ততই সে সংযুক্ত পিপলস্ ফ্রন্টে প্রধান ভূমিকা গ্রহণের বেশী যোগ্য হইবে।

অতএব আজ কমিউনিষ্ট এবং সমস্ত শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকের সম্মুখে কর্ত্তব্য হইতেছে জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী যাহাতে এক যোগে কাজ করে, সে জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি না করা, কোন বিঘ্ন বিপদে পশ্চাৎপদ না হওয়া সামান্যতম কোন সুযোগ ছাড়িয়া না দেওয়া। যতদিন না ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য সাধিত হয় এবং সর্ব্বহারা শ্রেণীর একটি ঐক্যবদ্ধ বিস্তৃত (mass) পার্টি গঠিত হয় ততদিন এই চেষ্টা চালাইতে হইবে। এখানে এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার যে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি সদস্য সংখ্যা সংগঠন ও মতবাদের দিক দিয়া যতই শক্তিশালী হইবে, যতই তাহারা শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রণী লোকদের এবং সাধারণভাবে শ্রমজীবী জনগনের বিশ্বাস ও সমর্থন লাভ করিবে সর্ব্বহারা শ্রেণীর ঐক্য ততই শীঘ্র কার্য্যে পরিনত হইবে, সংযুক্ত পিপল্‌স্ ফ্রন্ট গঠন ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করার সাফল্য ততই ব্যাপক হইবে। কারণ, জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য সাধনের সংগ্রামে কমিউনিষ্টারই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও অক্লান্ত যোদ্ধা।

আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের যখন প্রথম সূত্রপাত হয় সেই সময়ই মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্ "কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে" আন্তর্জ্জাতিক সর্ব্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের ঐতিহাসিক ভূমিকা কি হইবে তাহা ব্যাখ্যা করেন; তাঁহারা বলেন:—

"সমগ্র সর্ব্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ হইতে পৃথক কোন স্বার্থ তাহাদের (কমিউনিষ্টদের) নাই।.....অতএব কমিউনিষ্টরা কার্য্যক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় দল, যে দল অন্য সকলকে আগাইয়া লইয়া যায় অন্যদিকে মতবাদের দিক দিয়া তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর; সর্ব্বহারা আন্দোলনের অগ্রগতির পথ, আন্দোলনের অবস্থা ও সাধারণ ফলাফল তাহারা যেমন বুঝিতে সমর্থ শ্রমিক জন সাধারণ তেমন বুঝিতে সমর্থ নয়।"

কমিউনিষ্টরা তাহাদের শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তান; বুর্জ্জোয়াদের সহিত কোন সম্পর্ক এবং বুর্জ্জোয়াদের উপর কোন নির্ভরতা না থাকায় তাহারাই জনসাধারনের স্বার্থের প্রকৃত রক্ষক, তাহারাই খাঁটি আন্তর্জ্জাতিকতাবাদী, সুতরাং যুদ্ধ ও ফ্যাসিজম্‌এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন এবং শ্রমজীবি জনসাধারণ, গণতন্ত্রী পেটি বুর্জ্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের পক্ষে কমিউনিষ্টরাই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য সাধন এবং সংযুক্ত পিপলস্ ফ্রন্ট গঠনে সাফল্য অর্জ্জনের জন্য দিনের পর দিন কাজ করা প্রয়োজন এবং কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে ও সমগ্র কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। আন্তর্জ্জাতিক সর্ব্বহারা শ্রেণী এবং সমগ্র প্রগতিশীল মানব জাতির স্বার্থের জন্যই ইহার প্রয়োজন।

কংগ্রেসের কাজ

(প্রাথমিক ও জেলা কংগ্রেস নির্ব্বাচনের অভিজ্ঞতা এবং আগামী দু'মাসের মেম্বারকরার কাজ)

সোমনাথ লাহিড়ী।

[কংগ্রেসের সংগঠন ও আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কাজের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে এই রকম অভিজ্ঞতামূলক প্রবন্ধ আমরা আমাদের সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মীকে লিখে পাঠাতে অনুরোধ করছি।—সম্পাদক]

বরানগরের একজন সাধারন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক মার্চ্চেণ্ট অফিসের কেরাণী, পলিটিক্স ইত্যাদি নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাননা, আইন অমান্য ক'রে জেলেও যাননা। তবে ভোটের সময় কংগ্রেসকেই ভোট দেন, চেপেচুপে ধরলে কংগ্রেসের কাজের জন্যে কিছু চাঁদাও দেন, আর কোনো বিষয়ে কংগ্রেসর জিত হলে আন্তরিক খুসী হয়ে ওঠেন।

বরানগর কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচন নিয়েই কথাটা উঠেছিল। ভদ্রলোক বল্লেন, "আরে মশাই, কংগ্রেস ইলেক্শানের কথা আর বলবেন না, যত সব চোরের কাণ্ড—খালি মিউনিসিপালিটির কর্ত্তাত্বি করবার জন্যে কংগ্রেস কমিটি দখল ক'রে বসে থাকবার চেষ্টা। দেখুননা, কারখানার মালিক নরেন দত্ত যাকে বরানগরে কংগ্রেসের কাজ করতে একদিনও দেখলাম না, যে কংগ্রেস মুভমেণ্টে একবার জেলেও গেলনা—ইলেকশানের সময় তার লোক দিয়েই কমিটি ভর্ত্তি!

"এখন আবার জুটেছে এক 'লেবার'। আপনি যখন বলছেন তখন লোক তারা ভাল হতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের কাজ তারা কদিনই বা করছে? এখন তারাই নাকি এসে আমাদের খগেন চাটুয্যে ইত্যাদিকে তাড়াচ্ছে! এতদিন আমরা তো কংগ্রেস বলতে খগেন বাবুদেরই জানতাম; যা কিছু মুভমেণ্ট টুভমেণ্ট করা তা তো ওরাই করে এসেছে, জেল টেলও তো কতবার খাটল! ওদের বাদ দিলে কি কংগ্রেস চলে?"

বিশেষ ভেবে দেখবার বিষয়। ভদ্রলোক যে শ্রেণীর লোক সে শ্রেণী আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেস আন্দোলনে একটা প্রধান অংশ নিয়ে এসেছে। এঁরই দাদা, ভাই, ছেলে কংগ্রেস আন্দোলনের ক্যাডার বা অগ্রনী কর্ম্মী। গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে কংগ্রেস অফিস চালানো, তার সমাজ হিতকর কাজ করা, কোনো উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের নামে জনগণকে একত্র করা—এসব কাজেও আজ পর্য্যন্ত এই এই শ্রেণীর লোকেরাই অগ্রণী হয়ে এসেছেন। নন-কো-অপারেশান বা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেণ্টও যতটুকু চলেছে তাও বেশীর ভাগ এঁদেরই চেষ্টায়।

সুতরাং কংগ্রেস আন্দোলনকে শক্তিশালী করা মানে এঁদেরকে বাদ দেওয়া বা বিরোধী করে তোলা তো নয়ই বরং যতদূর সম্ভব এঁদেরকে নিয়েই কাজ করা।

কিন্তু তাই কি করা হয়েছে?

বরানগরের কথাই ধরা যাক। এখানে আমরা অর্থাৎ 'লেবার গ্রুপ' বছর খানেক; বছর দুয়েক কাজ করছি। সাধারণ বরানগরবাসী, যারা অধিকাংশই কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, আমাদের কথা, আমাদের পলিটিক্সের বৈশিষ্টের কথা জানেনা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কংগ্রেস অন্দোলন ও প্রচার চালানোর দিক দিয়েও বর্ত্তমানে আমাদের কাজ অন্য গ্রুপগুলোর চেয়ে কিছু বেশী হতে পারে, কিন্তু এমন খুব বেশী নয় যাতে সকলের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা যায়।

আর খগেন চাটুয্যে প্রভৃতি লোক এখানকার কংগ্রেসের সঙ্গে বহুদিন থেকে জড়িত। কংগ্রেস বলতে লোকে এখনও তাঁদেরকেই বোঝে। যে পথে তাঁরা আন্দোলনকে এতদিন চালিয়েছেন সে পথে স্বাধীনতা

আসবে না সত্যি, কিন্তু ভারতে ভারতীয় রাজ স্থাপন করবার সরল বিশ্বাস নিয়েই তাঁরা সে পথে চলেছিলেন এ কথাও সত্য নয় কি? সুতরাং এঁদেরকে বাদ দিলে, এমন কি যাতে এঁরা ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে যান এমন কিছু করলেও স্বাধীনতাকামী শক্তির অপচয় ঘটবে। অসীম ধৈর্য্য সহকারে এঁদের ভুল আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, কাজের মধ্যে টেনে এনে জনগণের বিপ্লবী ইনিশিয়েটিভ (পথ-প্রদর্শন)-এর প্রতি এঁদের বিরোধিতা দূর করতে হবে কিংবা অন্ততঃপক্ষে নিউট্র্যালাইজ (নিরস্ত) করতে হবে।

কিন্তু বরানগরের ইলেক্শানের সময় আমরা কি করলাম? খগেন বাবু প্রভৃতিদের হাতে ছিল সাব-ডিভিশন্যাল কমিটির চাবিকাঠি। তাঁরা ইলেকশানে হয়তো কংগ্রেসের ওপর তাঁদের প্রভুত্ব চলে যাবে এই ভয়ে প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির মিটিংই ডাকছিলেন না। আমাদের লেবার বন্ধুরা রেকুইজিশান দিয়ে মিটিং ডাকলেন। বাংলা কংগ্রেস সংগঠনের চিরাচরিত প্রথামত খগেন বাবুরা সে মিটিংকে অস্বীকার করলেন। লেবার বন্ধুরা মিটিংয়ে খগেন বাবুদের বাদ দিয়েই কমিটিও সাবডিভিশানের ডেলিগেটি বেছে নিলেন। খগেন বাবুরাও অমনি নিজেদের মধ্যে আর একটা বৈঠক ক'রে আর একটা কমিটি করলেন। বল্লেন সেইটাই ঠিক কমিটি, প্রথমটা ভুয়ো। ফলে উভয় দলই কংগ্রেস সংগঠন ও প্রচারের কাজে ঢিলে দিয়ে ডিসপিউটের তদ্বিরে মনঃসংযোগ করলেন।

অবশ্য পরে এ ভুল শোধরান হয়েছে। লেবার গ্রুপ নিজেদের অনেকগুলো সিট ছেড়ে দিয়ে এবং নরেন দত্তদেরও কিছু সিট ছাড়তে রাজী করিয়ে খগেন বাবুদের এনে বসিয়েছেন। শুনেছি একটা মিটমাট হয়ে যাবে।

এই রকম খগেন বাবু ও তাঁর সঙ্গীরা বাংলার সব জেলাতেই আছেন। সম্পূর্ণ বিপ্লবী মনোভাব হয়তো এঁদের অনেকের নেই, আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণারও এঁদের অভাব আছে। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় যে সব নেতা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জাতীয় সংহতিতে বাধা জন্মাচ্ছেন তাঁদের প্রতি অহেতুক দুর্ব্বলতাও এঁদের প্রায় সকলেরই আছে। সংগঠনের প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা থেকে এঁরা এই সব নেতার সমালোচনা করলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

কিন্তু তাই বলে তো তাঁদের হারানো যায় না! এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে শুধু সোশ্যালিষ্টদের একার চেষ্টায়, এমন কি সমস্ত লেফটের একার চেষ্টায়ও সাম্রাজ্যবাদকে হঠানো শক্ত। এই সত্য বুঝতে পেরেছি বলেই আজ বিস্তীর্ণতম, দৃঢ়তম জাতীয় সংহতি গড়ে তুলবার জন্যে কংগ্রেসের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি। কংগ্রেসকে যদি আমরা ক্যাপচার করতে যাই, অর্থাৎ সকলের সহযোগিতার গ্যারাণ্টি না পেয়েই যদি আমরা শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরে যেখানে পারি কংগ্রেসকে দখল ক'রে বসতে যাই তাহলে তো এই নীতিতেই গলদ হয়; স্বাধীনতা সংগ্রাম তাহলে শুধু আমাদের শক্তিতেই চালাতে হয়। আর তাই যদি আমাদের মত হয় তো কংগ্রেসের মধ্যে যাবার দরকার কি ছিল? বাহিরে থেকেই তো আমাদের নিজস্ব শক্তিতে চালাতে পারতাম।

কথা উঠবে, কিন্তু এই সব লোক ও এঁদের আত্মস্বার্থী নেতারা তো তা মনে করেন না। তাঁদের অনেকেই তো যেখানে পারেন ছলে, বলে, কৌশলে আমাদের সরিয়ে দিয়ে কংগ্রেসের সংগঠন যন্ত্রটা নিজেদের মুঠোর মধ্যে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন! সত্য ও অহিংসার মালা জপ করতে করতে বোগাস মেম্বার ও প্রয়োজন হলে ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে অফিস ক্যাপচার করতে তো কুণ্ঠিত হন না।

আমরা কথায় কথায় বলি ইউনাইটেড ফ্রণ্টের 'ইনিশিয়েটার ও বিল্ডার' হতে হবে প্রলেটারিয়েটকে অর্থাৎ জাতীয় সংহতির পথ আমাদের দেখাতে হবে, তাকে গড়েও আমাদেরই তুলতে হবে। এতো শুধু কথা নয়, কাজেও একে খাটাতে হয়। আন্দোলনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, তার গতি ও ভঙ্গী বিচার ক'রে আমরা কাজ

করছি, কাযেই গরজ আমাদেরই। সুতরাং তাঁরা না বুঝে যে ভুল করছেন আমাদেরও সে ভুল করলে চলবে কেন? দলগত স্বার্থের ভুল ধারণা থাকলে আমাদের চলবে না। সমগ্রভাবে কংগ্রেসের স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের নীতি, তাতেই আমরা সবচেয়ে বেশী লাভবান হব।

কংগ্রেসকে সমগ্রভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে লোক বা দল দিয়ে বিচার করলে চলবে না, মুভমেণ্টের মধ্যে লোক বা দলের অংশ, মুভমেণ্টের তীব্রতা ও ব্যাপকতা এই সবই আমাদের বিচার করতে হবে। যেখানে মুভমেণ্টের দিক থেকে আমরা প্রধান নই সেখানে সংখ্যাধিক্য হলেও আমাদের দলগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে মুভমেণ্ট এগুবেনা। আবার অন্য দলের যদি মুভমেণ্টের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকে, মুভমেণ্টের মধ্যে যদি তাদের একটা বিশিষ্ট স্থান থাকে তো সংখ্যায় কম হলেও মুভমেণ্টের হিসাবে তাদেরকে স্থান দিতে হবে।

জেচ্‌রি, বোগাস ভোটিং, অন্যায় সুবিধে নেওয়া ইত্যাদি যতই থাক অন্দোলন গড়ে উঠলে বা জনগণের সঙ্গে প্রকৃত কাজের সূত্রে আমাদের যোগ সংস্থাপিত হলে আমাদের হঠায় কে? ধরুন হুগলীর ইলেকশানের কথা। আমাদের স্পেশ্যালিষ্ট বন্ধুরা সেখানে মাত্র বছর খানেক কাজে লেগেছেন। অন্য দিকে খাদি গ্রুপ প্রভৃতি বহুদিন থেকে সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। তবুও যেহেতু আমাদের বন্ধুরা এই অল্প সময়ের মধ্যেই কংগ্রেস আন্দোলনের ভেতর একটা বিশিষ্ট স্থান নিতে পেরেছেন, গ্রামে গ্রামেও গ্রামবাসীদের ছোট খাট সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগ স্থাপন করতে পেরেছেন সেই হেতু প্রতিপক্ষদের হাজার রকম চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা সাব-ডিভিশান অফিসের ভার সম্পূর্ণরূপে পেয়েছেন। এবং মুভমেণ্টে তাঁরা অগ্রণী ও সুপ্রতিষ্ঠিত বলে এই অফিস তাঁদেরকে বাধা না দিয়ে তাঁদের কাজের সহায়তাই করবে।

অন্যদিকে নদীয়ার ইলেকশানের ফল হয়েছে অন্য রকম। সেখানে অফিস ক্যাপচারের ওপর খুব বেশী জোর দেওয়ায় অফিস আমাদের সোশ্যালিষ্ট বন্ধুদেরহাতে এসেছে বটে কিন্তু অন্য সব গ্রুপ, যারা যে রকমই হোক কংগ্রেসের কাজ কিছু না কিছু করত, তারা হাত গুটিয়ে বসেছে। অথচ মুভমেণ্ট আমরা এমন খুব বেশী কিছু করতে পারিনি যাতে একাই কংগ্রেসে পুরা কাজ চালতে পারি। ফলে অফিসটা অনেক পরিমাণে একটা ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে, মাস দুয়েক ধ'রে শুনলাম অফিসই খোলা হয়নি!

অন্য অন্য দল যেখানে কোনো নীতির ওপর না গিয়ে শুধু পরস্পরের প্রাধান্যের জন্যে মারামারি করছে সেখানে একদলের সঙ্গে সহযোগিতায় আমাদের সাময়িক সুবিধা হলেও সে লোভে তাদের মারামারির মধ্যে কখনই যাওয়া চলতে পারেনা। তার বদলে দুই দলের মধ্যে মিল করিয়ে একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা করাই উচিত। এই নীতিতে আমরা মধ্য কলিকাতার নির্ব্বাচনে কাজ করেছি এবং তাতে আমাদের প্রেষ্টিজ বেড়েই গিয়েছে।

সেখানে জ্যোতিষ ঘোষের দল চাইলেন বিপিন গাঙ্গুলীদের দাবিয়ে রেখে নিজেদের অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে। সংখ্যায় তাঁরা অনেক বেশী বটে কিন্তু আন্দোলনের দিক দিয়ে বিপিন বাবুরা অনেক বেশী কর্ম্ম তৎপর। কাজেই তাঁদের দাবিয়ে রাখলে সমগ্রভাবে কংগ্রেস আন্দোলনের ক্ষতি হ'ত। তাই আমাদের বন্ধুরা একটা সর্ব্ব-সম্মত লিষ্ট তৈরী ক'রে সকল দলের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। এমন কি তাঁরা নিজেদের সীট কিছু ছেড়ে দিয়েও অপর দলকে রাজী করাতে চেষ্টা করেন। এবং জ্যোতিষ বাবুর দলকে সমর্থন করলে যদিও তাঁরা কিছু বেশী সুবিধা পেতেন তবুও তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত এগ্রিড লিষ্টেরই পক্ষে থাকেন।

আগামী দু মাসের মেম্বার করার কাজ

এই সব অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সামনের দু তিন মাসের কাজ ঠিক করতে হবে।

এতদিন তো ইলেকশান ছিল। অন্য কোন কাজ বিশেষ কিছু করা হয়নি। এখন সামনে সেপ্টেম্বারের শেষ পর্য্যন্ত মেম্বার করার মেয়াদ। এখন থেকেই আমাদের সতর্ক হতে হবে যাতে মেম্বার ঠিক ভাবে করা

হয় এবং আমাদের সমস্ত কাজ শুধু মেম্বার করাতেই পর্য্যবসিত না হয়।

মেম্বার করার পদ্ধতিটা অবশ্য স্থান বা অবস্থা হিসাবে বদলায়। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় যে গ্রামে বা সহরে প্রথমতঃ মিটিং ডেকে কংগ্রেসের প্রোগ্রাম, জনগণের অর্থনীতিক দাবীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ, এবং কি ভাবে তা পাওয়া যেতে পারে সে গুলো বোঝাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মেম্বার করে যেতে হবে। তাদের আশু সমস্যা নিয়ে মিটিং, জলুস বা আন্দোলন যখনই করা হবে তখনই তাদের মেম্বার করারও চেষ্টা করতে হবে। পরে বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রত্যেক বয়স্ক লোককে মেম্বার হবার জন্য ধরতে হবে। এবং এই সব লোককে কংগ্রেসের গঠন ও আন্দোলনমূলক কাজের মধ্যে যথা সম্ভব টেনে আনতে হবে। মেম্বার করাটা যাতে আলাদা না হয়ে জনগণের আশু অর্থনীতিক ও রাজনীতিক দাবীর প্রতিদিনকার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই হয় তার চেষ্টা করা দরকার।

এতে কংগ্রেসের সত্যি মেম্বার ও প্রতিপত্তিই যে শুধু বাড়বে তা নয়, সংগঠনকারীদেরও একটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাবে যে তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে কতজন কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল, কতজন সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে সাহায্য করতে পারেন, আর কতজন এর বিপক্ষে, বাধা কোন দিক থেকে আসবে, কি ভাবে আসবে ইত্যাদি।

প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে কংগ্রেসের মোট মেম্বারের প্রায় অর্দ্ধেক ভাগ ভুয়ো। এই ভুয়ো বা বোগাস মেম্বার দু'রকমের। এক যাঁরা অনুরোধ বা তাগাদায় পড়ে সই করেছেন বা অন্যকে তাঁদের হয়ে সই করে দিতে অনুমতি দিয়েছেন। বি, পি, সি, সিতে যাবার আশায় বহু ভদ্রলোক দুশো তিনশো টাকা খরচ ক'রে এই রকম সব লোককে মেম্বার করান, এঁদের চাঁদাটা তাঁরা নিজেরাই দিয়ে দেন।

আর এক রকম ভুয়ো মেম্বার যাঁদের অস্তিত্বই নেই। টাকার জোরে মিথ্যে কতকগুলো নামকে মেম্বার ক'রে বহু মান্যগণ্য ব্যক্তিই আপন প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য বজায় রাখেন।

এই দুরকম বোগাস মেম্বারই বন্ধ করাতে হবে! বোগাস মেম্বারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেরাও বোগাস মেম্বার করলে ফল আরও খারাপ হবে, লোকে ক্রমশঃ কংগ্রেসের ওপর হতশ্রদ্ধা হয়ে যাবে। ভাড়াটে লোক দিয়ে তো মুভমেণ্টে বিশেষ করা যায়না। আর ভাড়াটে লোক খুব বেশী নিয়ে আসাও যায়না। যেখানে একজন লোক এক হাজার ভুয়ো মেম্বার করবে সেখানে আমরা যদি একশো সত্যিকার মেম্বার করতে পারি এবং তার মধ্যে জন পঁচিশেককেও সময়ে সময়ে সক্রিয় সহযোগিতায় টেনে আনতে পারি তাহ'লে মুভমেণ্ট আমরা অনায়াশে এগিয়ে যেতে পারব এবং ইলেকশানেও আমাদেরকে বাদ দেওয়া সহজ হবেনা। হয়তো সংখ্যা ও শক্তি অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব পেতে একটু দেরী হবে। কিন্তু আমরা কি এখনকার লাভের আশায় শুধু মুভমেণ্ট করছি? দূরদৃষ্টি আছে বলেই না অন্য দলের পলিটিক্সের চেয়ে আমাদের পলিটিক্সের শক্তি বেশী?

চাঁদা আমাদের প্রত্যেক মেম্বারের কাছ থেকে আদায় করতে হবে, তা সে যত গরীবই হোক; কারণ চাঁদাটা হচ্ছে মেম্বার হবার আগ্রহের প্রথম পরিচয়। অবশ্য চাঁদাটা ১৫।২০ দিনের কিস্তিতে আদায় করা যেতে পারে। তাতে আরও ভাল হবে, চাঁদা আদায়ের উপলক্ষে মেম্বারদের সঙ্গে সংগঠনকারীদের সংযোগ বাড়বে।

কংগ্রেসের সংগঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও কিছু বলবার ইচ্ছা রইল। কাজের সময় এই সহজ কথাটা মনে রাখলে অনেক ক্ষতি ও শত্রুতার হাত থেকে বাঁচা যাবে যে কংগ্রেস আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে আমরা অল্পদিন মাত্র এসেছি। পুরানো কংগ্রেস বিরোধিতার ফলে অনেকের মনে স্বভাবতঃই আমাদের প্রতি অবিশ্বাস আছে। কাজেই ধীর ও পরম সহিষ্ণুভাবে কাজ ক'রে আস্তে আস্তে আমাদের সমস্ত অকপট লোকের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে হবে। এখুনি প্রাধান্য ও কৃতকার্য্যতার আশায় লুব্ধ হলে চলবেনা।

দূরদৃষ্টির মধ্যেই আমাদের সাফল্যের বীজ নিহিত রয়েছে।

কানপুর হরতাল

বিশ্বনাথ দুবে

প্রায় পঞ্চাশ দিন বন্ধ থাকার পর কানপুরের মিলগুলো আবার চলতে আরম্ভ করেছে। কানপুর মজদুর সভার নেতৃত্বে যেমন মজুররা হরতাল করে বেরিয়ে এসেছিল, কানপুরের মিলগুলোকে অচল জড়বস্তুতে পরিণত করে দিয়েছিল, তারা ঠিক তেমনই মজদুর সভার নেতৃত্বে আবার নিজেদের কাজে ফিরে গেছে। মিল গুলোর ভিতর আবার স্পন্দন ফিরে এসেছে, জীবন ফিরে এসেছে। মিলমালিকেরা তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার বিষময় ফল খুব ভাল ভাবেই উপভোগ করেছে। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের কাছে, জাতির সম্মিলিত শক্তির কাছে তাদের মাথা নিচু করতে হয়েছে। যে সব দাবী তারা আগে মানতে অস্বীকার করেছিল সেইগুলির কয়েকটা এমনই মেনে নিয়েছে, আর কয়েকটা দাবীর বিষয়ে তারা বিবেচনা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

যদিও মালিকেরা কানপুর মজদুর সভাকে বর্ত্তমান অবস্থায় মজুরদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নেয়নি এবং মজদুর সভা তাদের মনের মত পুনর্গঠিত হলে পরে তাকে মেনে নেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; যদিও "কম পক্ষে ১৫৲ টাকা মাহিনা হওয়া উচিত" মজুরদের এই ন্যায্য দাবী তারা মেনে নেয়নি; যদিও মালিক ও মজুরদের মধ্যে ঝগড়ার পূর্ণ মীমাংসার ভার এক লেবার অফিসারের হাতে দেওয়া হয়েছে, যে লেবার অফিসার আমলাতন্ত্রের এক ক্রীড়নক মাত্র এবং নিজেও একজন আমলাতন্ত্রী, যার ইতিহাস নির্ম্মমভাবে হরতাল ভাঙ্গার কাহিনীতে পরিপূর্ণ; তবুও কানপুর হরতালে কানপুর মজুর শ্রেণী জয়যুক্ত হয়েছে। এই হরতালের জোরে কানপুরের মজুর শ্রেণী শতকরা ১০৲ টাকা থেকে ১২৲ টাকা বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব কানপুরের মিলমালিক দিগকে মেনে নিতে বাধ্য করেছে।

কানপুর হরতালের জয় পরাজয়ের এই হল সংক্ষিপ্ত কাহিনী। কিন্তু এইটাই সব নয়। কানপুর হরতাল আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে ও করে দেখিয়েছে। সেই অনেক কিছু কি তা' আমাদের আরও একটু বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

১। মজুর শ্রেণীর অর্থনৈতিক লাভের দিক থেকে কানপুর হরতাল মজুর শ্রেণীর শতকরা ১০৲ টাকা থেকে ১২৲ টাকা বেতন বৃদ্ধির দাবী মিল মালিকদের কাছ থেকে আদায় করে মজুর শ্রেণীর প্রভূত অর্থনৈতিক মুনাফা এনে দিয়েছে।

২। এই হরতাল বিজয়ী হওয়ার দরুণ কানপুর মজুর শ্রেণী তার আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়েছে, তাদের সংগঠন শক্তি শতগুণে বেড়ে গেছে, মজদুর সভার প্রভাব মজুর শ্রেণীর উপর সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হয়েছে।

৩। তাদের ন্যূনতম অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে সমগ্র মজুর শ্রেণীকে সংগ্রামে টেনে আনতে পেরেছে বলে এই হরতাল মজুর শ্রেণীর সর্ব্বনিম্নস্তরকেও জাগ্রত করে তুলেছে। এই হরতাল আন্দোলনকে এক নূতন স্তরে টেনে তুলেছে, কানপুর আন্দোলনকে মজুর শ্রেণীর অগ্রণী অংশ বিশেষের আন্দোলনরূপে গণ্ডীবদ্ধ না থাকতে দিয়ে এই আন্দোলনকে সমগ্র মজুর শ্রেণীর আন্দোলনরূপে পরিণত করেছে।

৪। মুসলিম্ লীগ সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে যে একটা কৃত্রিম ভেদ মজুর শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হয়েছিল, কানপুরের এই হরতাল সমগ্র মজুর শ্রেণীকে এই সংগ্রামে শ্রেণী হিসাবে আনতে সক্ষম হয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষকে চিরতরে নির্ম্মূল করে দিয়েছে, মজুর শ্রেণীর মধ্যে একতার ভিত্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে।

৫। এই হরতালে কেবল কানপুরের সাধারণ মজুররাই লাভবান হয়নি, হরতালের ফলে সকলের চেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে তারা যারা ছিল হরতালের নেতা—কানপুরের সাম্যবাদীর দল। হরতালের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদীরা পরিষ্কারভাবে কানপুর মজুর শ্রেণীকে জানিয়ে দিয়েছে যে, যে কোন সংগ্রামে মজুর শ্রেণী সাম্যবাদীদের পাবে সংগ্রামের পুরোভাগে। শুধু ইহাই নয়। হরতালের ফলে কানপুর মজুর শ্রেণীর উপর কানপুরের সাম্যবাদীদের সত্যিকারের নেতৃত্ব কায়েম হয়েছে। সমগ্র ভারতের সামনে ও বিশেষ করে মজুর শ্রেণীর সামনে সাম্যবাদীরা নিজেদের এক অজেয় শক্তি হিসাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে।

৬। কানপুরের হরতাল কেবল সুতাকলের মজুরদেরই হরতাল হয়নি। যদিও সুতাকলের মজুরেরা এই হরতাল প্রথমে আরম্ভ করেছিল, তবুও এই সংগ্রামে সুতাকলের মজুরেরা অন্যান্য কারখানার মজুরদিগকেও নিজেদের সংগ্রামরত সাথী হিসাবে আনতে পেরেছিল। এই হরতালে ধাঙ্গড়েরা, চামড়ার কলের মজুররা ও অন্যান্য কারখানার মজুরেরাও যোগদান করেছিল। সমগ্র কানপুর ব্যাপী এই হরতালের ফলে এই প্রথমে কানপুরের মজুরশ্রেণী প্রকৃত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কারখানার মালিকদের দেখিয়ে দিল যে যখন তাদের আত্মসম্মান রক্ষা করতে হয়, যখন সমগ্র জাতির প্রতিনিধিমূলক সংগঠনের সম্মান রক্ষা করতে হয়, তখন মজুরশ্রেণী কেমন এক হয়ে হাতে হাতমিশিয়ে দাঁড়াতে পারে, তা' সে সুতাকলের মজুর হোক বা চামড়ার কারখানারই মজুর হোক। "আম হরতাল" বা সাধারণ ধর্ম্মঘট যে কি জিনিষ তা' কানপুরের মজুরেরাই প্রথমে সংগঠিতরূপে ও কৃতকার্য্যতার সহিত প্রতিপন্ন করান।

৭। কানপুরের হরতাল প্রথম কার্য্যতঃ দেখায় যে মজুরদের শ্রেণী সংগ্রামে কৃষক শ্রেণী কি প্রকারে সাথী হয়ে দাঁড়াতে পারে। "প্যারী কম্যুনের" বিফলতার মূলতম কারণ যে মজুর শ্রেণীর সাথী হিসাবে কৃষকশ্রেণীর না দাঁড়ান, ভারতীয় মজুর আন্দোলনেরও এই অভাবটি কানপুরের হরতাল প্রথমে পূরণ করান। কানপুরের হরতালেই আমরা প্রথমে দেখি যে কানপুরের হরতালী ভাইদের সাহায্য করার জন্য দলে দলে কৃষক তার যা'কিছু সম্বল হাতে নিয়ে সহরের দিকে চলেছে! একজন নয় দু'জন নয়, একশত নয় দু'শত নয়, এক হাজার বা দু'হাজারও নয়, দশ দশ হাজারের কৃষকশ্রেণীর এক বিরাট শোভাযাত্রা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সহরে এসে পৌছালো। শ্রমিক শ্রেণী দেখলো এই সংগ্রামে তারা একা নয়, তাদের সাথী হিসাবে আছে লক্ষ লক্ষ চাষী।

৮। কানপুরের হরতাল প্রথম দেখালো যে কেমন করে শ্রেণী সংগ্রামের বিশেষ বিশেষ ন্যায্য দাবীর সংগ্রামকে এক সুনির্দ্দিষ্ট ও সুচিন্তিত মুহূর্ত্তে, সুপরিচালনার দ্বারা জাতীয় সংগ্রামে পরিণত করা যায়।

৯। কানপুর হরতাল পরিষ্কার ভাবে প্রতিপন্ন করল কি করে সংযুক্ত জাতীয় 'ফ্রন্ট' গড়ে তুলতে হয়, রাজেন্দ্র প্রসাদ-অনুসন্ধান-কমিটিকে যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট নিয়োগ করেছিল। এই কমিটি সমগ্র জাতির প্রতিনিধি মূলক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের মন্ত্রী মণ্ডলী দ্বারা নিযুক্ত হলে, সমগ্র জাতির বিশ্বাস অর্জ্জনে সক্ষম এবং নিজেও সমগ্র জাতির প্রতিনিধি স্থানীয়, এইরূপ এক কমিটীর রায়কে অগ্রাহ্য করা মানে সমগ্র জাতিকে অপমানিত করা, অতএব এই কমিটির রায়কে মিল মালিকেরা যখন অগ্রাহ্য করল তখন কানপুর মজুর শ্রেণীর সামনে দু'টী মাত্র পথ খোলা থেকে গেল। এক এই অপমান সহ্য করে চুপ চাপ বসে থাকা এবং দেখা যে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট কি করে, যার ফল হ'ত শোচনীয়তার, গ্লানির ও পরাজয়ের এক দৃষ্টান্ত বহুল ইতিহাস। অপর এক পথ ছিল এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া, মিল মালিকদের এই ঔদ্ধত্যের যথোচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া, মালিকের দলকে শিক্ষা দেওয়া যে জাতিও, বিশেষ করে, মজুর শ্রেণী এই রকম জাতীয় অপমান কোনদিন সহ্য করবে না। কানপুরের মজুর শ্রেণী এই দ্বিতীয় পথই বেছে নিল। নেতৃমণ্ডলীর অন্যরূপ ভাবনা থাকা সত্বেও কানপুর মজুর শ্রেণী তার আম হরলালের হাতিয়ার নিয়ে লড়াইয়ে নেবে পড়ল,

পশ্চাদ্‌মুখী নেতৃবৃন্দের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনলো এবং জাতীয় সম্মান রক্ষা কল্পে সর্ব্বশ্রেণী সেনানী হিসাবে নিজেকে জাতির সামনে প্রতিপন্ন করলো। মজুর শ্রেণী নিজে সংগ্রামে নেবে কংগ্রেসকেও সাথী হিসাবে এই জাতীয় সংগ্রামে নাবালো, শ্রেণী সংগ্রামকে জাতীয়সংগ্রামের স্তরে তুলে সমগ্র জাতির দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করল। মজুর শ্রেণীর আরব্ধ এই সংগ্রামকে কেন্দ্র করে পাশে প্রথমে দাঁড়ালো কানপুর কংগ্রেস কমিটী ও তার নেতা বালকৃষ্ণ শর্ম্মা, তার পাশে দাঁড়ালেন যুক্ত প্রদেশীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ও কমরেড্ জওহরলাল নেহেরু। কংগ্রেসের সাথে সাথে এই সংগ্রামের সহকারী হিসাবে দাঁড়ালেন যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রী মণ্ডলী। এই মন্ত্রী মণ্ডলী রাজেন্দ্র প্রসাদ কমিটীর প্রস্তাবগুলি মেনে নিয়ে সংগ্রামের প্রথম বিজয়ের সূচনা করলেন। কংগ্রেস কমিটীগুলি কেবল প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা ষ্ট্রাইকফণ্ডে হাজার হাজার টাকা তুলে দিয়েছে, রফি আহ্‌মদ কিদোয়াই নিজে প্রথমে মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে নিরপেক্ষতা রক্ষার সম্মোহন জালকে ভেঙে দিয়ে প্রকাশ্যে হরতাল ফণ্ডে টাকা সাহায্য করেন। কানপুরের মিউনিসিপালিটী ২৫ হাজার টাকা হরতালের সাহায্যের জন্য পাশ করেন। কংগ্রেস কমিটী-গুলি পিকেটিং করার জন্য ও ষ্ট্রাইককে অত্যন্ত সংগঠিত রূপে চালাবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেন ও পিকেটিং চালান এবং এই পিকেটিং করা অপরাধেই অনেক কংগ্রেসী সেচ্ছা সেবক ধরাও পড়েন। কানপুর হরতাল এই প্রকারে কংগ্রেস ও শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সম্বন্ধটীকে আরও সুদৃঢ় আরও ব্যাপক ও কার্য্যকরী করে তুললো।

এই সংযুক্ত জাতীয় ফ্রণ্টে কানপুরের মজুর শ্রেণী কেবল যে কংগ্রেসকে এনেছে তা' নয়, সে ন্যূনতম মজুর শ্রেণীর দাবী রক্ষার সংগ্রামের ভিত্তিতে, জাতীয় সম্মান রক্ষার ও মিল মালিকদের ঔদ্ধত্যের যথোচিত প্রত্যুত্তর দেওয়ার ভিত্তিতে, মুসলিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকেও সাথে আনতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলিম লীগও এই সংগ্রামকে অর্থ সাহায্য, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও পিকেটিং প্রভৃতির দ্বারা শক্তিশালী করে তোলে।

এই রকমে সমগ্র জাতিকে প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তা বিরোধী কানপুর মিল মালিকদের বিরুদ্ধে এক মিলিত জাতীয় সংগ্রামে একত্রিত করার সম্মান ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কানপুরের শ্রমিক শ্রেণীরই পাবার প্রথম সৌভাগ্য হল।

১০। কানপুরের হরতালের সূচনা, তার অগ্রগতি ও পরিপূর্ণতাকে যদি আমরা সমগ্র ভাবে দেখি তাহলে আমরা স্বতঃই বুঝতে পারব যে কানপুরের এই সংগ্রামে যদি কানপুরের শ্রমিক শ্রেণী নেতা হিসাবে এগিয়ে না আসতো তাহলে হরতালটা এই রকম সম্মিলিত জাতীয় সংগ্রামের আকার ধারণ করতো না, জাতির সমগ্র অগ্রগতিশীল অংশগুলি এ রকম একসূত্রে আবদ্ধ হতো না, মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস প্রতিক্রীয়া রিরোধী সম্মিলিত শক্তিরূপে এক প্লাটফরমে দাঁড়াতে পারতো না, হয়তো জাতির ইতিহাসে এক পরাজয়ের লাঞ্ছনার ও অবমাননার পালা সুরু হয়ে যেত।

১১। কানপুরের এই হরতাল প্রকৃত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রায়বাদী বন্ধুদের অতি উত্তমরূপে শিক্ষা দিল যে জাতীয় সংগ্রামে মজুরশ্রেণী শ্রেণী হিসাবে তার নেতৃত্ব কায়েম করতে পারে এবং সে যদি নেতা হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয় "তবে তাতে আন্দোলনের শক্তি, ক্ষমতা বাড়বে শতগুণে, এবং আন্দোলনের চেহারাটাই বদলে যাবে। যে সংঘবদ্ধতা, যে শৃঙ্খলা এবং দৃঢ়তা নিয়ে শ্রমিক তার শ্রেণীগত দাবীর জন্য সংগ্রাম করে সেই সংঘবদ্ধতা, শৃঙ্খলা এবং দৃঢ়তা আনবে স্বাধীনতা আন্দোলনে।"

(দীনবন্ধুরায়, মন্দিরা, আষাঢ়, ১৩৪৫)

১২। কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই দেশের মধ্যে বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনের এক শ্রেণীর নেতার মধ্যে সংস্কারবাদ মূলক ভাবধারা জোরে দেখা দিয়েছে। তাঁরা নিজেদের বোঝাতে আরম্ভ করেছেন এবং জনসাধারণকে বলতে আরম্ভ করেছেন যে দেশ

এখন স্বরাজ লাভ করেছে, দেশে এখন কংগ্রেসী রাজত্ব চলেছে, ইংরাজ শাসনের অবসান হয়েছে অতএব আর কোন Mass action বা লাট কাউন্সিলের বাহিরে কোন আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। উপরন্তু তারা এ রকম বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে, যে সব সভা, শোভযোত্রা, হরতাল প্রভৃতি চলেছে বা হচ্ছে তাতে মন্ত্রীমণ্ডলীকে বিব্রত করা হয় মাত্র, আসলে জনসাধারণের কোন হিতকারী কাজ মন্ত্রীমণ্ডলীকে করতে অবসর দেওয়া হয় না। কেবল দক্ষিনাচারী নেতাদের মধ্যেই নয়, এই ধারণা বামপন্থী নেতা জওহরলাল নেহেরুর মধ্যেও সংক্রমিত হলো এবং তারই ফলে প্রস্তাবিত "কৃষক মার্চ্চ" শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হলো। কানপুর হরতাল এই সংস্কারবাদী মোহকে ভেঙ্গে দিয়েছে। কানপুর হরতাল প্রতিপন্ন করেছে যে মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে যদি জনসাধারণের শক্তিময় অভিযান না থাকে তাহলে মন্ত্রীমণ্ডলীর সুপারিশের স্থান হয় ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে।

স্বাধীনতা ও পল্লীসমাজ

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

ভারতে যুক্ত রাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের আশঙ্কা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের নির্ভীক উক্তিতে আমাদের নিয়মতান্ত্রিক নেতাদের মহলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, সত্যমূর্ত্তি ও বল্লভভাই প্যাটেলের বিবৃতি একই সুরে বাঁধা; তাঁরা যে ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ ছেড়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদিদের সঙ্গে আপোষ করবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এ বিষয় এখন আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। অবশ্য যাঁরা দিনের আলোতেও চোখ বুজে অন্ধ হয়ে বসে থাকতে চান তাঁদের কথা আলাদা। যাঁর একটু চোখ কান খোলা আছে তিনিই বুঝতে পারছেন যে নিয়ম তান্ত্রিক পথে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহনের বাধা এখন আর কংগ্রেসের দক্ষিণাচারীদের দিক থেকে বড় একটা থাকবে না।একটু চুণকাম করে দিলেই চক্ষুলজ্জা বাঁচিয়ে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র গ্রহনে সম্মতি দেবেন। গান্ধীজী তাঁর 'হরিজনে' অনেক রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন; কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপারেও তিনি এখনও পর্য্যন্ত কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের উক্তি হতেই তাঁর মত অনেকটা অনুমান করা যায়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন চালু করতে রাজী হয়ে কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিকতার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অবশ্য সংস্কারের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের রাস্তা তৈরী করা অসম্ভব নয়; কিন্তু সে রকম কোন পরিকল্পনা কংগ্রেস গ্রহণ করেছেন বলে কংগ্রেসের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নামে কেউ অপবাদ দিতে পারবে না। গান্ধীজী অবশ্য অনেক সময় বলেছেন যে তরবারীর শাসনের অবসান করবার জন্যই কংগ্রেস প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন গ্রহণ করেছে; কিন্তু কার্য্যত দেখা যাচ্ছে যে রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপারে তরবারীর শাসন তো অবসান হয়ই নাই, এমন কি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জন সাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী যে বিধি নিষেধ তুলে দিতে চেয়েছিলেন, লাট-সাহেব তাঁর বিশেষ ক্ষমতার বলে সেগুলি তুলে দিতে রাজী হন নাই। এ ব্যাপার নিয়েও যে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করা হবে তা মনে করা দুরাশা; বড় জোর আরও দুই একটি প্রদেশে যদি এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয় তা হলে কিছুদিন পরে ফেডারেশন ব্যাপার নিয়ে গোলমাল আর একটু ভাল করে পাকিয়ে উঠলে, তখন নাটকীয় ভঙ্গিতে পদত্যাগ করে

কংগ্রেস যে জন সাধারণের স্বার্থের দিকে সব সময়েই সতর্ক দৃষ্টি রাখছে সেই কথাটা ভাল করে জাহীর করবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ হতে পারে। অবশ্য পদত্যাগের গোলমালটা সহজেই মিটে যাবে যেমন যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের ব্যাপারে হয়েছিল; কিন্তু কার্য্যত ফলটা দাঁড়াবে এই যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের বিরোধী বামপন্থীদের শক্তি সংহত হয়ে উঠবার আগেই তাকে ধ্বংস করা যাবে। ঠিক এই রকম ব্যাপারই হরিপুরা কংগ্রেসের সময় ঘটেছিল। বামপন্থীদের এখন থেকেই কথাটা ভেবে রাখা ভাল।

এ দিকে কংগ্রেসের আজকালকার কার্য্যতালিকা দেখলেই বোঝা যায় যে ফেডারেশন ব্যাপার নিয়ে প্রাদেশিক মন্ত্রীরা পদত্যাগ করতে পারবেন না। পল্লী উন্নয়ন, চরকা, ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে যে পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করবার ভার প্রাদেশিক মন্ত্রীদের উপর দেওয়া হয়েছে, সেটা সফল করতে হলে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের সময়ে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের পদত্যাগ করা অসম্ভব। কাজেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন যেমন চালু হতে থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাটিও ঠিক সেই রকম ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস গলাধঃকরণ করবে। অন্ততঃ কংগ্রেসের বড় কর্ত্তারা কংগ্রেসকে দিয়ে এই কাজটী করিয়ে নেবার চেষ্টার ত্রুটী করবেন না। বামপন্থীরা যাতে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি না করতে পারে সে দিকে গান্ধীজীর অনুপম শক্তি নিয়োজিত করতেও দক্ষিণাচারীরা কিছুমাত্র অবহেলা করবেন না, একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। সুতরাং পূর্ব্বাপর ইতিহাস বিবেচনা করলে এই সিদ্ধান্তেই পৌছাতে হয় যে রাষ্ট্রপতির আপত্তি সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনে কংগ্রেস সক্রিয়ভাবে বাধা তো দেবেই না, এমন কি নিষ্ক্রিয় উদাসীনতার ভান দেখিয়ে সক্রিয়ভাবে এর মধ্যে দিয়েই রাস্তা করে নেবে। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলের উক্তি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। অবশ্য এই কৌশলজাল ছিন্ন করে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ থেকে কংগ্রেসকে ফিরিয়ে এনে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন ব্যাহত করা একেবারে অসম্ভব নয়; কিন্তু তার জন্য সমস্ত বামপন্থী দলের সংহত ঐক্য ও দক্ষিণাচারীদের প্রত্যেকটী কৌশল আয়ত্ত করে তাঁদের কূটনীতিকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার মতো বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও কর্ম্ম শক্তির দরকার।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এতদিন সংগ্রাম চালিয়ে কংগ্রেস এখন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোষ করবার জন্য এতটা ঝুঁকে পড়েছে কেন? ভারত কি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে না স্বাধীনতার সার বস্তু ইতিমধ্যেই তার করায়ত্ত হয়েছে? আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা ঠিক যে সময় আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির অনুকূল, দেশের আর্থিক সঙ্কটের ফলে যখন বিরাট কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, সচেতন রাজনৈতিক কর্ম্মীরা যখন এই আন্দোলনকে লক্ষ্যপথে পরিচালনা করতে প্রস্তুত, ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তটী হেলায় নষ্ট করবার জন্য আমাদের কংগ্রেসের বড় কর্ত্তাদের এত আকুল আগ্রহ কেন? এর উত্তর পেতে হলে কেবলমাত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন বা যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলে চলবে না, কারণ এর মূল আরো গভীরতর স্তরে নিহিত। যদি সেই মূল ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যায় তা হলেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের বিশিষ্ট ভঙ্গি ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবিতা সব কিছুরই একটা সুসঙ্গত কারণ দেখতে পাওয়া যাবে। যুক্তরাষ্ট্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন, পল্লী উন্নয়ন, চরখা, ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা, গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, ধনিক শ্রমিকের সমন্বয় নীতি প্রভৃতি আমাদের রাজনৈতিক রোগের লক্ষণ মাত্র; এর নিদান তত্ত্ব খুঁজতে হলে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির চাবিকাঠি যাঁর হাতে তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কীয় মতবাদ ও এই মতবাদের প্রধান পরিপোষক, ধারক ও বাহক ভারতীয় ধনিক শ্রেণী ও এর লেজুড় হিসাবে পরিগণিত অচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা আকাঙ্খার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। অবশ্য সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে দেখতে গেলে গান্ধীজীর মতবাদ ধনিকদের অবাধ শোষণের পরিপন্থী; কিন্তু দেশের ও জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁর মত কার্য্যক্ষেত্রে প্রসারকামী ভারতীয়

ধনিকদের অবাধ শোষণ কায়েম রাখবার পক্ষে একটা শক্তিশালী অস্ত্র। সেই জন্য চতুর ভারতীয় ধনিকশ্রেণী সত্য ও অহিংসার মূর্ত্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ ও কর্ম্ম পন্থাকে নিজেদের শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখবার জন্য ব্যবহার করছে ও তাঁকে সব রকমে ইংরেজ ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এতদিন অকুণ্ঠিত সাহায্য করেছে। আর আজ যে সংগ্রামের পরিবর্ত্তে নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে কংগ্রেস ঝুঁকে পড়েছে তারও কারণ এই যে বর্ত্তমান জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক অবস্থায় ভারতীয় ধনিকদের ইংরেজ ধনিকদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার জন্য সংঘর্ষের পথে এগিয়ে যেতে হলে গণশক্তিকে আর নিজেদের মুঠোর মধ্যে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

পাছে বেশী লোভ করতে যেয়ে সবই হারাতে হয় সেই ভয়ে ভারতীয় ধনিকের! "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধংত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই মহাজন অনুসৃত নীতি অবলম্বন করে ইংরেজ ধনিকদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় ব্রতী হয়েছেন। আর ইংরেজ ধনিকেরাও উক্ত বহু পরীক্ষিত নীতির অনুসরণে আর কুণ্ঠিত নন; কারণ একে তো রাশিয়ার জুজুর ভয় আছেই, তার উপর আবার ইউরোপের দুই দুর্দ্ধর্ষ ডিকেটটারের প্রতাপে ভূমধ্য সাগর ও সমগ্র মহাদেশ তাঁদের কূট রাজনৈতিক চাল বানচাল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর সঙ্গে জুটেছে আবার তাঁদেরই মন্ত্রশিষ্য জাপানের গুরুমারা বিদ্যার প্রয়োগ। এর উপর যদি বোঝার উপর শাকের আঁটীর মতো ভারতবর্ষের বিপুলগণশক্তির অভ্যুত্থান হয় তাহলে তাঁদের ও তাঁদের জ্ঞাত ভাইদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনাটা একেবারেই হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। সুতরাং ভারতীয় ধনিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপোষ রক্ষা করে যদি মুনাফার একটা অংশ বাঁচিয়ে রাখা যায় তা হ'লেও সেটা তাদের পক্ষে অনেকটা সান্ত্বনার কথা। একথা সবাই জানে যে গান্ধীজীর রাষ্ট্রিক ও আর্থিক তত্ত্বের মধ্যে পশ্চাদগামী মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে তাঁ'র মত শেষ পর্য্যন্ত নৈরাজ্যবাদী; এই নৈরাজ্যবাদের সাময়িক রূপ তথাকথিত স্বরাজ। আর্থিক ব্যাপারেও তাঁর মতবাদ অনেকাংশে মধ্যযুগীয়। তিনি পূর্ব্বে যন্ত্র শিল্পের একান্ত বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। এখনও তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যাতে কলকারখানা বড় বড় সহরগুলিতেই আবদ্ধ থাকে। গ্রামের প্রাচীন পল্লী ব্যবস্থা ও পঞ্চায়েৎ এখন ভেঙ্গে গিয়েছে বা অন্ততঃ তার মধ্যে বিরাট ফাটল ধরেছে। তিনি সেই সনাতন ব্যবস্থা আবার ফিরিয়ে আনতে চান ও গ্রামগুলি যাতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে ও গ্রাম্য স্বরাজ একটা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে সেই দিকে তিনি তাঁর বিপুল কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করছেন। হয়তো তিনি এখনো মনে মনে বিশ্বাস করেন যে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনা "১৯৩৫এর ভারত শাসন আইনের" চৌহদ্দীর মধ্যে থেকেও এমন ভাবে করা যেতে পারে যাতে ইংরেজ ও ভারতীয় ধনিকদের শক্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করে এনে বড় বড় সহরও সহরতলীর মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যাবে আর দেশের জনসাধারণের মোটা ভাত কাপড়, সাধারণ শিক্ষা ও কুটীর শিল্পের ব্যবস্থা করা গ্রাম্য স্বরাজের মধ্য দিয়েই সম্ভব হবে। আবার অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই সুগঠিত ও শক্তিশালী পল্লী সমাজ যত বেশী আত্মপ্রতিষ্ঠ ও গ্রামের প্রত্যেক পরিবার যত বেশী আত্মনির্ভরশীল হবে তত বেশী পরিমাণে ইংরেজ শাসনের শিকড়গুলি আলগা হয়ে যাবে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই সমস্ত দেশের শাসন ব্যবস্থা ইংরেজদের হাত থেকে ক্রমশঃ দেশের এই পঞ্চায়েতগুলির হাতে এসে পড়বে ও এর ফলে প্রত্যেকটী গ্রাম স্বরাজ লাভ করবে।

বিলাতের পার্লামেণ্টে পেশ করা একটা পুরাণো সরকারী রিপোর্ট থেকে এই প্রাচীন পল্লী ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা করা যায়।

"ভূগোলের দিক থেকে দেখলে একটা গ্রামে আছে কয়েক শো বা কয়েক হাজার একর চাষের জমি আর পোড়ো জমি। রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে দেখলে সেই গ্রামের সঙ্গে একটা সমবায় বা পৌরসঙ্ঘের সাদৃশ্য বোঝা যাবে। প্রধান বাসিন্দা বা পাটেল গ্রামের সমস্ত ব্যাপারেই তত্ত্বাবধান করেন, গ্রামবাসীদের বিবাদ নিষ্পত্তি করেন,

শান্তিরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখেন আর খাজনা আদায় করেন; গ্রামের মুহুরি চাষবাসের হিসাব-দপ্তর রাখেন; একজন বা দুজন ফৌজদারী ব্যাপারের ভার নিয়ে থাকেন আর পথিকদের একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নিরাপদে পৌঁছে দেন; একজন গ্রামের চৌহদ্দি স্থির রাখেন, দরকার হ'লে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেন; পুকুর নালা ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক চাষের জন্য জল বিলির ব্যবস্থা করেন; ব্রাহ্মণের উপর দেবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভার থাকে; গুরুমশায় ছেলে-মেয়েদের হাতে খড়ি দেন; জ্যোতিষী পাঁজি দেখে শুভ অশুভ দিন স্থির করেন। সাধারণত এ কয়েকজন কর্ম্মচারী গ্রামের কাজ চালিয়ে যান; তাদের সংখ্যা কোথাও বা বেশী, কোথাও বা কম। স্মরণাতীত কাল থেকে এইরকম সাদাসিদে ভাবে গ্রামের শাসন চলে এসেছে। গ্রামগুলির চৌহদ্দি নিয়ে অদলবদল অতি কদাচিৎ হয়েছে। আর যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হলেও গ্রামের জীবন বিশেষ বদলায় নি। একই নাম, পরিমিত, চিন্তাধারা, গোষ্ঠিবর্গ পর্য্যন্ত বহুকাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। রাষ্ট্রের উত্থানপতন নিয়ে গ্রামবাসীরা ব্যতিব্যস্ত হয় নি; গ্রামের অস্তিত্ব যতদিন অক্ষুণ্ণ, ততদিন রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্ত্তন তাদের বিচলিত করতে পারে নি, গ্রামের অন্তর্ব্যবস্থনে কোন বিকৃতি ঘটে নি। এখনও গ্রামের মোড়ল পাটেল; ঝগড়া নিষ্পত্তি, সাজার ব্যবস্থা আর খাজনা আদায়ের ভার তার হাতে।"*

১৮৩২ সালে হাউস অফ কমন্সের সিলেকট কমিটির রিপর্টে লর্ড মেটকাফের বিবৃতির এক যায়গাতে ভারতীয় পল্লীব্যবস্থার যে বিকরণ ও তার ধ্বংসের উপায় বর্ণনা করা আছে তার থেকে বোঝা যায় যে ইংরেজ শাসকেরা কতকাল আগে আমাদের সভ্যতার চেহারা ধরতে পেরেছিল। আর সব চেয়ে কৌতুকের বিষয় এই যে আমাদের দেশের লোক এখনও সেই বাস্তব সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলে ধর্ম্মও আধ্যাত্মিকতার বুলি আওড়াচ্ছে। ইংরেজরাও সব জেনে শুনে এটাকে সব রকমে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এমনকি ইউরোপেও যাতে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বুলি আওড়াবার জন্য আমাদের পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করা হয় তার ব্যবস্থা করতে কার্পণ্য করছে না। আর আমরাও বেশ মহানন্দে ভাবতীয় আধ্যাত্মিকতার রসে ডুবে আছি। এতে কার লাভ আর কার ক্ষতি সেটা আর কাউকে বুঝিয়ে বলবার দরকার নাই। লর্ড মেটকাফের বিবৃতিটী এই রকম:—

"এই পল্লী সমাজগুলি ছোট ছোট গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ; তাদের পক্ষে যা কিছু দরকার সবই প্রায় তাদের নিজেদের মধ্যে ছিল, আর এতটা স্বাধীন ছিল যে বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম ছিল না বললেই হয়। যেখানে আর কিছুই টেঁকেনা সেখানে এগুলোই যেন চিরস্থায়ী। বংশের পর বংশ ভেঙ্গে পড়ে, বিপ্লবের পর বিপ্লব আসে; হিন্দু, পেগান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজ এরা সবাই পরের পর প্রভুত্ব করেছে; কিন্তু পল্লী সমাজগুলি এক রকমই আছে। গণ্ডগোলের সময় তারা অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে; শত্রুবাহিনী দেশের মধ্য দিয়ে চলে যায় আর পল্লী সমাজগুলি তাদের গৃহ পালিত পশু গুলিকে গ্রাম প্রাচীরের মধ্যে সংগৃহীত ক'রে নিয়ে শত্রুকে অক্ষত দেহে চলে যেতে দেয়। লুণ্ঠন ও ধ্বংস যদি তাদেরই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় এবং প্রযুক্ত শক্তি যদি অদম্য হয় তবে তারা দূরে বন্ধুভাবাপন্ন গ্রামে পালিয়ে যায়; কিন্তু ঝড় থেমে গেলে তারা ফিরে এসে আবার নিজেদের কাজে লেগে যায়। কোনো দেশে যদি কয়েক বছর ধরে এমন লুণ্ঠন ও হত্যা চলতে থাকে যাতে গ্রামে বাস করা যায় না তা হলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন গ্রামবাসীরা নিরুপদ্রবে নিজেদের সম্পত্তি ভোগ দখল করবার সুযোগ ফিরে আসবামাত্র আবার নিজেদের গ্রামে চলে আসে। এর মধ্যে এক পুরুষ যদি মরেও যায়, তা হলেও পরের পুরুষ ঠিক ফিরে আসবে, দেশের বাপের যায়গায় ফিরে আসবে, গ্রামগুলি

* (প্রগতি সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৬০—৬১ পৃষ্ঠা)

ঠিক আগেকার যায়গাতেই গড়ে উঠবে, বাড়ীগুলির অবস্থান ঠিক আগেকার মতোই হবে; আগেকার জমিগুলিতেই তাদের সন্তান সন্ততি বসবাস করবে।... কোন সামান্য কারনে তারা কখনো চলে যায় না, কারণ প্রায়ই তারা নানা রকম (রাজনৈতিক) বিশৃঙ্খলা ও ওলট পালটের মধ্যেও তাদের নিজের যায়গায় টিকে থেকেছে; লুঠতরাজ ও উৎপীড়নকে সার্থকভাবে বাধা দেবার মতো যথেষ্ট শক্তি তারা অনেক সময় অর্জ্জন করতে পেরেছে।" "আমার (লর্ড মেটকাফ) মনে হয় যে, যে গ্রাম্য সংগঠন বাইরের এতো ধাক্কা সহ্য করেও টিঁকে থাকতে পারে, তাকে সহজেই ভিতর থেকে আমাদের আইন ও আদালতের সাহায্যে নষ্ট করে দেওয়া যায়; আমি (লর্ড মেটকাফ) মনে করি যে সবার উপরে মামলা বাজির মধ্য দিয়েই এর ধ্বংসের রাস্তা তৈরী হবে।"

এই উদ্ধৃত্তির শেষ অংশের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে কেমন করে এই পল্লীব্যবস্থা ধ্বংশের বীজ বপন করা হয়েছিল। ১৮৫৩ সালে "নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন" পত্রিকায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন, "সমাজ ব্যবস্থার এই ছোট ছোট অটল ছাঁচগুলি এখন ভেঙ্গে গেছে বা যাচ্ছে। ইংরেজ সৈনিক আর ট্যাকস্ সংগ্রাহকের অত্যাচারের চেয়ে ভারতীয় জীবনে ইংরেজদের বাষ্পযন্ত্র আর অবাধ বাণিজ্য নীতির (ফ্রী ট্রেড) প্রাদুর্ভাবই এর কারণ। পল্লী সমাজে প্রত্যেক পরিবারই ছিল আত্মনির্ভর; ঘরেই চরকা কাটা, কাপড় বোনা হত, বাড়ীর লোকই স্বহস্তে চাষবাদ করত। ইংরেজ আসার ফলে চরকা আর তাঁত বন্ধ হল, ছোট ছোট অর্দ্ধ সভ্য সমাজের অর্থ নৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে গেল, আর এমন এক বিরাট সমাজ বিপ্লব আরম্ভ হল, যার তুলনা এশিয়ার ইতিহাসে মেলে না।

অসংখ্য নিরীহ, শ্রমশীল, কুলপতি শাসিত পল্লী-সমাজ ছিন্নভিন্ন হল, প্রাচীন জীবনধারা ও জীবিকা-নির্ব্বাহের বংশপরম্পরাগত ব্যবস্থা নষ্ট হল, যন্ত্রনার অবধি রহিল না। এ ঘটনায় আমারা দুঃখ পাই নিশ্চয়, কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে এই নিরীহ পল্লী-সমাজগুলিই ছিল প্রাচ্য স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের যথার্থ ভিত্তি, এরা মানুষের মনকে ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখত, এদের শাসনে মানুষ হত নিষ্ক্রিয়, কুসংস্কার ও প্রাচীন বিধিনিষেধের দাস, নিজের মহিমা ও পৌরুষ সম্বন্ধে উদাসীন। আমরা ভুলতে পারি না যে তাদের ছিল একপ্রকার বর্ব্বরসুলভ অহমিকা; তাদের অনুরাগ ছিল শুধু খানিকটা জমির উপর; সাম্রাজ্যের পতন, অকথ্য অত্যাচার, জনহত্যা তাদের কাছে প্রাকৃতিক ঘটনার মত লাগত, বিচলিত করত না; অথচ তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিয়ে কেউ আক্রমণ করলে তারা ছিল একেবারে অসহায়। আমরা ভুলতে পারি না যে এই নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়ারূপে উৎকট, লক্ষ্যহীন অনাচারের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, নরহত্যা পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের স্থায়ী-ষ্ঠানে প্রবেশ করেছিল। আমরা ভুলতে পারি না যে এই ক্ষুদ্র সমাজগুলিকে জাতিভেদ ও দাসপ্রথা কলুষিত করে রেখেছিল, সেখানে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধককে পরাভূত করার চেষ্টা না করে বশ্যতা স্বীকার করত। অচঞ্চল, অন্ধ নিয়তিতে বিশ্বাস সামাজিক উদ্যোগ ও উন্নতি-প্রচেষ্টাকে নিষ্পিষ্ট করত, প্রকৃতিপূজার বিধানে মানুষের অধঃপতন সূচিত হত, আর জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ নতজানু হয়ে হনুমান ও গোমাতার অর্চ্চনা করত।

এ কথা সত্য যে ইংরেজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দুস্থানে এই সমাজবিপ্লব ঘটিয়েছিল তা নিন্দনীয়, আর তারা প্রাচীন ব্যবস্থার একেবারে উচ্ছেদ করেছিল। কিন্তু সে আলোচনা এখন অপ্রাসঙ্গিক। প্রশ্ন হচ্ছে এই:— এশিয়ার সমাজব্যবস্থায় আমূল বিপ্লব না এলে সমগ্র মানবজাতীর পক্ষে অভীষ্টসাধন সম্ভব কি না? যদি না হয়, তবে শত অপরাধ সত্ত্বেও সেই বিপ্লবে ইংলণ্ড অজ্ঞাতসারেই ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে।

এই সকল আত্মসম্পূর্ণ সমাজগুলির উৎপাদন পদ্ধতি এমনই সরল যে এগুলির একই আকারে পুনরাবৃত্তি হয় এবং ঘটনাচক্রে বিনষ্ট হ'লেও এরা ঐসব জায়গায়

আবার পূর্ব্বেরই নাম নিয়ে দেখা দেয়। [অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার] এই সরলতার মধ্যেই এসিয়ার সমাজগুলির পরিবর্ত্তন হীনতা ও সনাতনত্বের গূঢ় রহস্য বুঝবার চাবীকাঠি রয়েছে। সমাজ ব্যবস্থার এই সনাতনত্বের সঙ্গে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির নিয়ত ধ্বংস ও নূতন ক'রে পত্তন এবং নূতন রাজবংশসৃষ্টির ইতিহাসের কি অদ্ভুত অমিল! রাষ্ট্রগণের ঘনঘটায় সমাজের আভ্যন্তরীন অর্থ নৈতিক সম্পর্কগুলির কোনও রূপান্তর হ'ত না।"

[ক্যাপিট্যাল, ১ম ভল্যুম্, কার সংস্করণ পৃঃ ৩৯৩-৩৯৪] *

* লেখকের কংগ্রেস নেতাদের সম্বন্ধে মতামতের সঙ্গে আমাদের একটু পার্থক্য আছে—সম্পাদক।

(৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ।)

স্বায়ত্তশাসনে। বৃহত্তর ব্যাপারে, সমগ্র ভারত শাসনে সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টি হবে আরো শতগুণে তীক্ষ্ণ। অতএব আদর্শবাদীর স্বপ্ন ছেড়ে দিয়ে বাস্তবের ভিত্তিতে দেখ্‌লে আমরা দেখ্‌বো যে ফেডারেশন সম্পর্কে সত্যমূর্ত্তির কল্পনা আমূল মিথ্যা, সুভাষচন্দ্রের ধারণাই খাঁটি। সঙ্কটগুলির ইতিহাস থেকে এটাও স্পষ্ট বোঝা আছে যে সমাধান কোন্ পথে। বিহার উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশের সঙ্কটের অবসানের কারণ সংগ্রামেচ্ছু জন-সাধারণের সহায়তা। সিন্ধু এবং বাংলার সঙ্কটের অনিশ্চয় পরিণতির কারণ মন্ত্রীমণ্ডলীর জনপ্রিয়তার অভাব।

ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটা অতি আবশ্যক অঙ্গ বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর পতন, এবং বাংলায় গণ-সমর্থিত; এবং গণ-সমর্থক মন্ত্রীত্বের স্থাপন। পূর্ব্বেই আমরা বলেছি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত লড়্‌বার ক্ষমতা কার আছে। আছে শ্রমিকের, কৃষকের, আছে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের। এই জন-সাধারণের, গণের ইচ্ছা ও সংগ্রামস্পৃহা যদি প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে প্রতিফলিত না হয় তবে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলায় যথেচ্ছ যোগদান খুবই দুরূহ হয়ে উঠ্‌বে, পদে পদে মন্ত্রীমণ্ডলী ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত কর্‌বে, সংগ্রামে বাধা দেবে।

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর অজেও অবসান ঘটে নি কেন? হক মহাশয়ের সমর্থক দুটী দল পর পর মন্ত্রীদের কৃষক বিরোধী নীতি লক্ষ্য করে হক মহাশয়কে ত্যাগ করেছেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যেও নওশের আলী সাহেব হক-মণ্ডলী পরিত্যাগ করেছেন। তবু হক মন্ত্রীত্ব টিকে আছে কি করে?

শুধু একটী কারণে, শক্তিশালী কৃষকপন্থী, গণপন্থী নেতৃত্বের অভাবে। এখনও যাঁরা হকমন্ত্রীত্ব সমর্থন করছেন তাঁরা মনে করেন, শত দোষগুণে সত্ত্বেও হক সাহেবই মন্দের ভালো। আর যারা সুবিধা-পন্থী তারাও জানে যে যতক্ষন তাদের গণ-আন্দোলনের সম্মুখীন হয়ে তাদের সামনে নিজেদের জবাবদিহী না কর্‌তে হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা নিরাপদ। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটানো অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব কংগ্রেসকে আজই এগিয়ে আস্‌তে হবে কৃষকদের পক্ষ নিয়ে। হয়ত তাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েকটী সম্ভ্রান্ত জমিদার কংগ্রেসের বিরোধিতা কর্‌বেন কিন্তু কয়েকলক্ষ কৃষক সেই মুহূর্ত্তেই কংগ্রেসকে সাহায্য করতে উদ্যত হবে।

কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিপত্তি, সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে, কৃষক-সভা এবং কৃষক-প্রজা সমিতির সহযোগে কৃষক আন্দোলনকে সফল করে তুল্‌তে হবে। আজ ২৪-পরগনায় কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চল্‌ছে, তার খবরও কাগজে বড় একটা বেরোয় না। কংগ্রেসের প্রতিপত্তি কৃষকদের স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের উপর অত্যাচার বন্ধ কর্‌তে হবে। রাজসাহী ও নদীয়াতে ইক্ষুচাষীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ চল্‌ছে। কংগ্রেসের প্রতিপত্তির সাহায্যে ইক্ষুচাষীদের উপর অত্যাচার বন্ধ কর্‌তে হবে। ময়মনসিংহ আজ বন্যাপ্রপীড়িত, বিধ্বস্ত। শুধু দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ কর্‌লেই কংগ্রেসের দায়িত্ব ঘুচ্‌বে না। সেই কৃষকদের কাছে গিয়ে তাদের কৃষক সভায় সঙ্ঘবদ্ধ কর্‌তে হবে, হক মন্ত্রী-মণ্ডলীর কাছে বন্যাপ্রপীড়িতের জন্য সাহায্য দাবী কর্‌তে হবে।

যদি আজ বাংলায় কংগ্রেস কৃষকের পক্ষ নিয়ে বাংলায় জন-সাধারণের সাম্‌নে দাঁড়াতে পারে, কৃষক আন্দোলনই যদি হয় বাংলার কংগ্রেসের মেরুদণ্ড তা হলে হকমণ্ডলীর বহু সমর্থক কংগ্রেসের সমর্থন কর্‌তে উদ্যত হবে। কংগ্রেস যদি তার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে কৃষক আন্দোলন জাগিয়ে তোলে, তবে তার ভয়ে সুবিধাবাদী কম্পিত বক্ষে কংগ্রেসের শরণ নেবে। হক মন্ত্রী-মণ্ডলীর পতন, তা হলে হবে অনিবার্য্য বাংলা কংগ্রেসের কলঙ্ক স্খালন তাতেই হবে।

ভারতে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব

বিভূতি গুহ

সমস্যা

ভারতবর্ষের সমস্যা মূলতঃ দুইটী। প্রথমতঃ রাষ্ট্রিক দিক হইতে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির আওতায় মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রথায় গণ্ডীবদ্ধ। এই দুইটী সমস্যাই আবার পরস্পর জড়িত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষকে চাহিয়াছেঃ (১) কাঁচামাল যোগানোর ক্ষেত্র হিসাবে; (২) তৈরী মাল বিক্রির বাজার হিসাবে; (৩) বাড়তি পুঁজি খাটাইবার কেন্দ্র হিসাবে।

সে আজকের কথা নয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ বণিক পুঁজিপতির দল ভারত হইতে বাণিজ্যের নামে অজস্র ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া ইংলণ্ডে শিল্প-সাধন করে, কল কারখানার সৃষ্টি করে। সেই কল কারখানার পেট ভরাইতে প্রয়োজন হয়, সস্তায় কাঁচা মাল। শস্য শ্যামলা বিরাট ভারতবর্ষ সে তাগিদ পূর্ণ করিল। বিলাতের কারখানার প্রয়োজনে ভারতবর্ষকে শুধু কৃষি কার্য্যেই আবদ্ধ থাকিতে হইল। বিলাত হইল সাম্রাজ্যবাদের সহর; ভারত হইল গ্রাম।

শুধু কাঁচামালের ক্ষেত্রেই নয়, বিলাতের কারখানার তৈরী মাল কাটাইবার জন্য চাই বাজার। তাহারও জন্য প্রশস্ত এই ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ। ফলে, ভারতের কুটির শিল্প গেল; কারখানার মালের সাথে প্রতিযোগীতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার উপর যোগ হইল, আইনের কঠোরতা। শিল্পীর দল গ্রামে যাইয়া কৃষিতে ভীড় জমাইল। কৃষকের দুরবস্থা আরও বাড়িয়া গেল।

বিলাতে পুঁজিপতিদের লাভের কড়ি পুঞ্জীভূত হইল। সে পুঁজি আরও অধিক লাভে খাটাইবার পথ চাই। অনুন্নত ভারতবর্ষ বিলাতী পুঁজি প্রবেশের দ্বার খুলিয়া দিল। অজস্র বিলাতী পুঁজি ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়িল। রেল, ষ্টীমার, ডক, খনি, চা কফি রবার বাগান, চটকল, ব্যাঙ্ক, বিদেশী ব্যবসা প্রভৃতি কারবারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঁজি প্রবেশ করিল; অজস্র লাভ করিয়া সবটুকু রস শুষিয়া লইয়া চলিল।

সাম্রাজ্যবাদের এই ত্রিধারা ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে প্রথমতঃ নূতন করিয়া মধ্যযুগীয় সামন্ত ব্যাবস্থার পত্তন করা হইল। ধ্বংসোন্মুখী দেশীয় রাজন্যবর্গকে নবজীবন দেওয়া হইল। সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে এই সমস্ত নেটিভ্ প্রিন্সের দল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছায়া তলে নূতন ধনতান্ত্রিক পৃথিবীতে, পুরাতন ফিউদাল সমাজের প্রতীক হইয়া রহিল। ভারতের এক তৃতীয়াংশ জুড়িয়া রাষ্ট্রে, ফিউদাল স্বেচ্ছাতন্ত্র, সমাজে মধ্যযুগীয় বর্ব্বর শোষণ, অনুন্নত মান্ধাতার আমলের পশ্চাৎপদ ব্যবস্থা রহিয়া গেল। অন্যদিকে, ব্রিটিশ ভারতে নূতন করিয়া জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া ফিউদাল সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখা হইল। সমস্ত ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের ছায়াতলে ফিউদাল তন্ত্র বাঁচিয়া রহিল। শুধু তাহাই নয়, ফিউদাল যুগেরও পূর্ব্বের অতি প্রাচীন নিম্নতম সমাজ ব্যবস্থার চিহ্ন রহিল। ভারতে শতকরা দুই জন লোক আজ এই আদিম সমাজ ব্যবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আজও ইহার ভূত, প্রেত ম্যাজিকে বিশ্বাসী-অর্দ্ধযাযাবর; জীবনযাত্রা তাহাদের অতি নিম্নে। কুকি, নাগা কোল, ভীল, সাঁওতাল এই সমাজেরই প্রতিনিধি।

দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের মত ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক সহজ গতিপথ রুদ্ধ হইল। ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংস হইল বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের

কল্যাণে দেশীয় কল কারখানা গড়িয়া উঠিল না। অস্বাভাবিক অবস্থায় অজস্র বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া যৎসামান্য দেশীয় শিল্পের প্রসার হইল, কিন্তু তাহাও বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হইয়াই।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রে রহিল সাম্রাজ্যবাদী স্বেচ্ছাতন্ত্র। একটু একটু করিয়া তাহাকে গণতন্ত্রের পোষাক পরান হইল বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাতন্ত্রের নগ্নতা তাহাতে ঢাকা পড়িল না। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ডিক্টেটারীর আমোঘ দণ্ড অক্ষুণ্ণ রহিল। গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে ভারত থাকিল বঞ্চিত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ফলে ইহাই হইল ভারতবর্ষের সমস্যা।

সমাধান

তাই, ভারতের আজ দুইটী সমস্যা। একটী, রাজনৈতিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন হইতে মুক্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার। দ্বিতীয়টী, সামাজিক-অর্থনৈতিক, ফিউদাল সমাজ ব্যবস্থার ও আদিম সমাজের উচ্ছেদ; কলকারখানার প্রসার ও জীবন প্রণালীর উন্নতি। এই দুইটী সমস্যার সমাধান হইবে একই সাথে। এই সমস্যা সমাধানের পথই বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

মধ্যযুগে, সমস্ত ইউরোপব্যাপী ছিল, ফিউদাল সমাজ-ব্যবস্থা ও ফিউদাল স্বেচ্ছাতন্ত্র। সে ছিল, নাইট, ব্যারন, ফিউদাল প্রভু ও ধর্ম্মযাজকদের প্রভুত্বের যুগ। সে দিন, নূতন বিপ্লবী শ্রেণী বুর্জ্জোয়ারা, সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লব সাধন করিয়া, ফিউদালতন্ত্রের উচ্ছেদ করে, কলকারখানার প্রসার করে, জীবন প্রণালী উন্নত করে ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। ইহা ছিল বুর্জ্জোয়াদের ঐতিহাসিক কার্য্য ও বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল ইহার উদ্দেশ্য, তাই ইহাকে বলা হয় বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ১৭৮৯ সাল ও তাহার পরের বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব ইহারই নিদর্শন।

ভারতের সমস্যা কতকটা অনুরূপ হইলেও, সম্পূর্ণ এক নয়। তাই ভারতের বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে সে কালের বিপ্লবের পার্থক্য আছে যথেষ্ট।

এখন দেখা দরকার কোন্ কোন্ শক্তি ভারতের এই বিপ্লবে যোগ দিবে? স্বভাবতঃ তাহারাই যোগ দিবে, যাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে শোষিত ও নিপীড়িত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলে যাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ।

প্রথমতঃ মজুর শ্রেণী: ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও ভারতের কর্ম্মরত মানুষের শতকরা ১৪ জন মজুর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিপ্রথার কৃপায় ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শোষিত; সমাজের নিম্নতম স্তরে ইহাদের স্থান। একদিকে ঘণ্টা হিসাবে খাটিতে হয় বেশী, অন্য দিকে মজুরীর হারও নগণ্য, তাহার উপর ছাঁটাই ত আছেই; বেকারের সংখ্যা অজস্র। সাম্রাজ্যবাদী দেশেও যে গণতান্ত্রিক অধিকার, বৃদ্ধবয়সের ইন্‌সিওরেন্স, প্রসূতির ব্যবস্থা, কম শ্রম-সময়, শিক্ষা, ভাল বাসের বন্দোবস্ত প্রভৃতি মজুর শ্রেণী পায়, উপনিবেশিক ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে মজুর শ্রেণী তাহা হইতেও বঞ্চিত। তাই ইহারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী শক্তি।

দ্বিতীয়তঃ কৃষক শ্রেণী: কৃষকের ভিতরে শ্রেণীভেদ আছে, যথা, জমিহীন কৃষক বা কৃষি মজুর, গরীব কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক ও ধনী কৃষক। জমিহীন কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা শোষিত—সহরের মজুরের মতই ইহারা গ্রাম্য সর্ব্বহারা। গরীব কৃষকের ২।১ বিঘা জমি থাকিলেও, ইহারা প্রায় মজুরেরই মত; দেনার দায়ে আকণ্ঠনিমগ্ন, জমিদার-মহাজন-সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারে নিপীড়িত, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে ও শাসনে শোষিত। মধ্যবিত্ত কৃষকের অবস্থাও শোচনীয়। জমীদার-মহাজন-সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ইহাদেরও উপরে। ধনী কৃষকের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইলেও, জমিদারী প্রথায় ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনে, ইহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ। তাই, **সমস্ত** কৃষক শ্রেণী ফিউদাল তন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী।

তৃতীয়তঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী: সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানার বিস্তার খুবই অল্প, তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকুরীর অভাবে বেকার। দারিদ্র্য

ইহাদের অসহনীয়; জীবন দুর্ব্বিসহ। তাই ইহারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী।

এই তিনটী শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিপ্লবী শক্তি। ইহারা ব্যতীত সমাজের উচ্চস্তরে আর একটী শ্রেণী আছে, তাহারা বুর্জ্জোয়া শ্রেণী। ইহাদের স্থান কোথায়? প্রশ্ন উঠিতে পারে সমস্ত বুর্জ্জোয়া শ্রেণীরই স্বার্থ এক, সবাই প্রতিক্রিয়াশীল—সে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জ্জোয়াই হউক কি দেশীয় বুর্জ্জোয়াই হউক। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে দেশীয় বুর্জ্জোয়া শ্রেণী জীবন মরণ সমস্যার সম্মুখীন নয় সত্য, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় কলকারখানা প্রসারের বিরোধী হওয়ায়, ইহাদের লাভের অংশ সঙ্কুচিত। রাষ্ট্রে অধিকার না থাকায় নিজ স্বার্থের অনুকূলে আইন করিতে অপারগ। তাই ইহাদের স্বার্থের সহিত সাম্রাজ্যবাদী শাসকের স্বার্থের সংঘাত বর্ত্তমান।

এ বিষয়ে চীন বিপ্লব সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া ষ্টালিন বলিয়াছেন, "সাম্রাজ্যবাদী দেশে বিপ্লব এক বিষয়: সেখানে বুর্জ্জোয়ারা অন্য দেশের উৎপীড়ক; সেখানে বুর্জ্জোয়ারা বিপ্লবের সমস্ত অবস্থায় প্রতিক্রিয়া-শীল; সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশরূপে জাতীয়তার রূপ নাই। উপনিবেশ ও পরাধীন দেশ সমূহের বিপ্লব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের: সেখানে অন্য দেশের সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল বিপ্লবের একটী অংশ; এই শৃঙ্খল সেখানে জাতীয় বুর্জ্জোয়াদেরও স্পর্শ করিতে বাধ্য, সেখানে জাতীয় বুর্জ্জোয়ারা, কোনও স্তরে এবং কিছু সময়ের জন্য, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাহাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, সেখানে জাতীয়তা স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হিসাবে বিপ্লবের অংশ হইয়া দাঁড়ায়।"

তাই ষ্টালিনের কথায়, সাম্রাজ্যবাদী দেশের 'বুর্জ্জোয়ারা বিপ্লবের সমস্ত অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল' কিন্তু উপনিবেশে 'জাতীয় বুর্জ্জোয়ারা কোনও স্তরের ও কিছু সময়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাহাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিতে পারে।'

দেখা গেল, ভারতীয় বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে উচ্চস্তরের মুষ্টিমেয় বুর্জ্জোয়া জাতীয়তা বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক, প্রতিক্রিয়াশীল। বুর্জ্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সত্য কিন্তু ইহারা গণ-বিপ্লব ভয়েও ভীত। তাই ইহারা দোদুল্যমান অবস্থায়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা আজও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত **মিশিয়া যায় নাই।** এই দোদুল্যমান শক্তিকে জোর করিয়া সাম্রাজ্যবাদীর দলে ঠেলিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা বৈপ্লবিক নির্ব্বুদ্ধিতা; বরং গণ শক্তির চাপে ইহার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বার্থকে কাজে লাগাইবার জন্য জাতীয় যুক্ত ফ্রন্টে রাখার প্রচেষ্টাই বৈপ্লবিকতা।

তাই মোটামুটি দেখা যায়, ভারতীয় বিপ্লবে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া দুইটী বিরুদ্ধ শক্তি। একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় রাজন্যবর্গ, রাজা মহারাজা, জমীদার ও জাতীয়তা বিরোধী সর্ব্বোচ্চ স্তরের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগত বুর্জ্জোয়া; অপর দিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীমজুর, কৃষক মধ্যবিত্ত ও বুর্জ্জোয়া শ্রেণী।

ভারতীয় বিপ্লব সম্পন্ন হইবে, এই **বিভিন্ন** শ্রেণীর সম্মিলিত শক্তিতে। কিন্তু বিপ্লব পরিচালনে চাই সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপদ্ধতি। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চাই, বিপ্লবের প্রতি ধাপে স্পষ্ট নির্দ্দেশ। কোন্ শ্রেণী দিবে সেই নির্দ্দেশ, সেই কর্ম্মধারা? কোন্ শ্রেণীর প্রভাবে বিপ্লব সুসম্পন্ন হইবে?

প্রথমতঃ বুর্জ্জোয়া শ্রেণী: ইহারা দোদুল্যমান; তাই আগাগোড়া সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট বৈপ্লবিক কর্ম্মপন্থা ইহারা দিতে পারে না। বিপ্লব পরিচালনায় তাই ইহারা অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ মধ্যবিত্তদের শ্রেণী: হিসাবে ঐক্য নাই, স্থায়িত্বও নাই। আর্থিক দিক দিয়া ইহাদের ঠিক শ্রেণীই বলা যায় না; বুর্জ্জোয়া ও মজুরের মাঝে ইহারা দোদুল্যমান। তাই, ইহাদের কোনও সুস্পষ্ট শ্রেণী-ভাবধারা নাই; ফলে বৈপ্লবিক কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ ইহারাও দিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ কৃষক শ্রেণী: সমস্ত কৃষক শ্রেণীর ভিতরে রহিয়াছে বিভিন্ন স্তর, ঐক্য নাই; সাম্রাজ্যবাদী যুগে

ইহারা মূল শ্রেণীও নয়। তাই, ইহারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবে কর্ম্মধারার নির্দ্দেশ দিতে পারে না।

তাহার পর মজুর শ্রেণী: ইহারা ঐক্যবদ্ধ, স্থায়ী ও সাম্রাজ্যবাদী যুগে একটী মূল শ্রেণী। ফলে ইহাদের সুস্পষ্ট ভাবধারা আছে। উপরন্তু, সাম্রাজ্যবাদের কৌশল, পুঁথি স্থান সমূহে, ইহার স্নায়ু কেন্দ্রে, কলকারখানা, খনি, রেল, ষ্টীমার, ডক প্রভৃতিতে ইহারা কেন্দ্রীভূত; সাম্রাজ্যবাদী শাসন যন্ত্রও আবার ইহারই সন্নিকটে। তাই, ইহারা সহজেই সাম্রাজ্যবাদ অচল করিয়া দিবার কাজে অগ্রণী হইতে পারে।

সুতরাং একমাত্র মজুরশ্রেণীর কর্ম্মসূচিতে ও প্রভাবে (hegemony) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম—বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হইতে পারে। এই বিপ্লবের ধারাও হইবে মজুর শ্রেণীর বৈপ্লবিক ধারা—ষ্ট্রাইক সংগ্রাম। সমস্ত দেশব্যাপী কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্তের সাধারণ ষ্ট্রাইকের ভিতর দিয়াই এই বিপ্লব অগ্রসর হইবে।

তাই দেখা যায়, ভারতীয় বিপ্লবের ভিতরের কথা হইতেছে, বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব—জমি, রুটি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম। ইহার বাহিরের রূপ হইতেছে মজুর শ্রেণীর বৈপ্লবিক ধারা—ষ্ট্রাইক্; বিপ্লবের ভার মজুর শ্রেণীর। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিন যাহা বলিয়াছেন, ভারতীয় বিপ্লব সম্বন্ধে তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলা চলে, "সমাজের দিক হইতে, ইহা বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কিন্তু সংগ্রামের ধারা হিসাবে ইহা মজুর বিপ্লব। ইহা বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব কারণ নিজ শক্তির সাহায্যে, যে উদ্দেশ্যের দিকে ইহার প্রত্যক্ষ গতি ও যে আদর্শে পৌছান প্রত্যক্ষরূপে সম্ভব ছিল, তাহা হইতেছে, গণতন্ত্র, আট ঘণ্টা শ্রম সময় এবং অভিজাতদের প্রভূত সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত করণ ইহা ১৭৯২ এবং ১৭৯৩ সালের ফরাসী বুর্জ্জোয়া বিপ্লবে সমস্তই প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমাধা হইয়াছিল।

"সঙ্গে সঙ্গেই .....(ইহা) মজুর বিপ্লব। মজুর শ্রেণী পরিচালক ও আন্দোলনের অগ্রদূত ছিল বলিয়াই নহে উপরন্তু মজুর সংগ্রামের বিশেষ উপায়—ষ্ট্রাইক, জনগণকে জাগরিত করিবার প্রধান যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ঘটনাবলীর নিশ্চিত পরিণতির পথে তরঙ্গসম গতির ইহা ছিল একটী বিশেষ অভিব্যক্তি।"

ভারতীয় বিপ্লব কি বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবেই শেষ হইয়া যাইবে? নিশ্চয়ই নয়। বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, মজুর শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগ্রামের ভিতর দিয়া মজুর সোশ্যালিষ্ট্ বিপ্লবে পরিণত হইবে। গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সোশ্যালিষ্ট্ বিপ্লবের ভিতর কোনও চীনের দেওয়াল টানা যায় না।

তাই দেখা যায়, ভারতীয় বিপ্লব বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হইলেও, সেকালের ইউরোপের বুর্জ্জোয়া বিপ্লবের সহিত পার্থক্য অনেক। সেদিনকার পারিপার্শ্বিকী ও আজের পারিপার্শ্বিকীর তফাৎ যথেষ্ট। তফাৎটা মোটা-মুটী: (১) সে কালের বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল, পুঁজিপ্রথার অগ্রগতির যুগে, আজ পুঁজিপ্রথা ধ্বংসোন্মুখ; (২) সে দিন বিপ্লব ঘটিয়াছিল আজকের সাম্রাজ্যবাদীরই দেশে, আজ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে; (৩) সে দিন মজুর শ্রেণী ছিল অচেতন, সঙ্ঘবদ্ধতার ছিল অভাব, আজ মজুর শ্রেণীর ভিতর বিপ্লবী চেতনা দেখা দিয়াছে—মজুর বিপ্লবী আন্তর্জ্জাতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে, (৪) সে দিন পুঁজিপ্রথা বিশ্বব্যাপী তাহার বিজয় অভিযানে অগ্রসর, আজ পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ হইতে পুঁজিপ্রথা তিরোহিত—সোশ্যালিষ্ট্ সমাজ প্রতিষ্ঠিত। (৫) সে দিন সমস্ত পৃথিবী বিচ্ছিন্ন, এক যোগ সূত্রে গ্রথিত হয় নাই, আজ যানবাহন ও অর্থনীতিতে সমস্ত পৃথিবী এক যোগ সূত্রে গ্রথিত—সাম্রাজ্যবাদীর অক্টোপাসের শুঁড় পৃথিবীব্যাপী।

তাই সমস্যা কতকটা এক হইলেও ভারতীয় বিপ্লবের রূপ সে দিনকার বিপ্লব হইতে বিভিন্ন। বিপ্লবের পার্থক্য:

(১) ভারতীয় বিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবের অংশ। ভারতের বিপ্লবে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় স্তম্ভ ধ্বসিয়া পড়িবে;; বহু দেশ, বহু জাতি পাইবে মুক্তি। সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ হইবে দুর্ব্বল। সে দিনকার বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল কতকটা বিভিন্ন। (২) জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন হইবে মজুর শ্রেণীর প্রভাবে ও কর্ম্মপন্থায়, মজুর বিপ্লবের ধারায়। সে দিনকার বিপ্লব সম্পন্ন হইয়াছে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে। (৩) ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিণত হইবে মজুর সোশ্যালিষ্ট বিপ্লবে। সে দিনকার বুর্জ্জোয়া বিপ্লব সেইখানেই থামিয়া গিয়াছিল।

যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতা

সম্পাদকীয়

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলালের ফেডারেশন বিরোধী উক্তি লক্ষ্য করে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার পূর্ব্বতন সভাপতি সার ফ্রেডারিক হোয়াইট বলেছেন যে কংগ্রেসেরই কোনো বিশিষ্ট নেতা তাঁকে এই মর্ম্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস ফেডারেশন গ্রহণই করবে।

কথাটা অত্যন্ত গুরুতর এবং অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। অতএব সংবাদটী কাগজে প্রকাশ হওয়ার পরে সুভাষচন্দ্র এর বিরুদ্ধে একটী বিবৃতি দেন। তাতে "বিশিষ্ট" নেতাটীর মতের তীব্র বিরুদ্ধতা ক'রে তিনি বলেন যে কংগ্রেসের সংখ্যা- গরিষ্ঠ দল যদি ফেডারেশন গ্রহণ করার প্রস্তাব অনুমোদন করেন তবে তিনি কংগ্রেসের সভাপতিত্ব পরিত্যাগ করে সারা দেশব্যাপী ফেডারেশন বিরোধী আন্দোলন চালাবেন।

মহা উদ্ধাস্ত হয়ে "বিশিষ্ট" নেতার একজন বিশিষ্ট সঙ্গী, শ্রীসত্যমূর্ত্তি সুভাষচন্দ্রের বিবৃতির একটী পাল্টা জবাব কাগজে প্রকাশ করলেন। সুভাষচন্দ্রের তীব্র-স্বর তাঁর পার্লামেণ্টারী সুরে বাঁধা কানে অত্যন্ত কর্কশ বোধ হলো। ফেডারেশন একেবারেই অগ্রাহ্য এ নীতি শ্রীসত্যমূর্ত্তির কাছে অসহ্য মনে হয়। তিনি চান যে ফেডারেশনে তিনটি জিনিষ সংশোধন করা হয়—(১) দেশীয় রাজ্যে নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তন, (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার সরাসরি নির্ব্বাচন, (৩) দেশরক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে মন্ত্রীদের বড়লাটকে উপদেশ দেবার ক্ষমতা প্রদান। এই রকম ভাবে সংশোধিত হলে শ্রীসত্যমূর্ত্তির মতে কংগ্রেসের ফেডারেশন গ্রহণ সম্পর্কে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক অংশের যে কতদূর অধোগতি হয়েছে সেটা লোকে বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলো। এও সবাই বুঝলো যে সুভাষচন্দ্র তাঁর বিবৃতিতে যে তীব্র স্বর ব্যবহার করেছেন সেটা কত প্রয়োজনীয় এবং যুক্তি-যুক্ত। নিয়মতান্ত্রিক অংশের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গতি যদি রুদ্ধ করতে হয় তবে তার একমাত্র উপায় যে সুভাষ-চন্দ্রকে সমর্থন করে ফেডারেশন বিরোধী দলের শক্তি

বৃদ্ধি করা তাও সবাই বুঝলো। অতএব সত্যমূর্ত্তির বিবৃতি প্রকাশ হবার পরদিনই বোম্বাইএর নেতা শ্রীযুক্ত নরীম্যান এবং কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক নেতা মাসানীর একই সঙ্গে দুটী বিবৃতি বেরুলো। দুজনেই সুভাষচন্দ্রকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। তারপর পাটনা, কলকাতা ইত্যাদি নানা স্থানে সভা করে সুভাষচন্দ্রের উক্তির সমর্থন করা হলো। "আনন্দবাজার পত্রিকা" সত্যমূর্ত্তির বিরুদ্ধে দণ্ড প্রয়োগ করবার দাবী জানিয়েছে, কেননা তিনি কংগ্রেস সভ্য, এবং কংগ্রেস হরিপুরায় স্পষ্ট ভাষায় ফেডারেশন বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন।

১৫ই জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র স্পষ্টভাবে বলেছেন যে কংগ্রেসের যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ এবং আত্মহত্যা একই জিনিষ, অতএব যদি কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে তবে সে আত্মহত্যায় তিনি যোগ দেবেন না। তিনি একথাও বেশ স্পষ্টভাবে বলেন যে হরিপুরা কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সেটা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার "তীব্র নিন্দা এবং সম্পূর্ণ বিরোধিতা" করা উচিত। অতএব কংগ্রেসের কোন সদস্যের এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবার অধিকার নেই।

পুরাতন গীতি গাওয়া খুব সুখপ্রদ নয়, কিন্তু এখানে হরিপুরা কংগ্রেস সম্বন্ধে দু একটা কথা না বলে থাকা যায় না। ফেডারেশনের যে প্রস্তাব হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছে তার চড়াসুরে না ভুলে সমাজতন্ত্রী দলের কয়েকজন সদস্য প্রস্তাবটীকে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যে আবছায়াভাবে ফেডারেশন বিরোধী একটা প্রস্তাব গ্রহণ না করে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ঠিক কি প্রক্রিয়ায় সংগ্রাম করতে হবে তার একটা নির্দ্দেশ প্রস্তাবে দেওয়া উচিত। নিয়মতান্ত্রিক নেতারা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বল্লেন "আমাদের সংগ্রামের প্রক্রিয়া আগে থেকেই শত্রুপক্ষকে জানতে দেওয়া উচিত নয়।"

আজ কি দেখা যাচ্ছে? সমাজতান্ত্রিকদের প্রস্তাবটাই ঠিক না নিয়মতান্ত্রিক সমালোচনাটাই ঠিক? যদি সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া থাকতো কি প্রক্রিয়ায় ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে তবে কি আজ কারো সাহস হতো গোপনে অথবা প্রকাশ্যে ফেডারেশনের সহযোগিতা করবার? সমাজতন্ত্রীদের প্রস্তাবটী যদি গৃহীত হতো, হয় তো তাতে সত্যমূর্ত্তি প্রকাশ্যেই কংগ্রেস বর্জ্জন করতেন। কিন্তু তাতে কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি হতো কি? এক নিয়মতান্ত্রিক সত্যমূর্ত্তি কংগ্রেস ছেড়ে যেতো সত্যি কিন্তু সহস্র সংগ্রামেচ্ছু স্বদেশ সেবক তার স্থান নিত। তাতে কংগ্রেসের শক্তি বাড়তোই, কমতো না। মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সদস্য শ্রীরাঘবেন্দ্র রাও কংগ্রেস ছেড়ে সাম্রাজ্যবাদের দলবৃদ্ধি করেছিলেন, তাতে কি কংগ্রেস আন্দোলন ব্যাহত হয়েছে? বরং শ্রীরাঘবেন্দ্রই আজ আবার কংগ্রেসে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অনিচ্ছুক হয়ে যদি কেউ কংগ্রেস ছেড়ে দিতে উদ্যত হন তবে তাঁর অবর্ত্তমানে কংগ্রেস আন্দোলন ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না যতটা হয় সেই অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে খুশী করবার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্ষুণ্ণ করায়।

"শত্রুপক্ষকে সংগ্রামের প্রক্রিয়া জানিয়ে দেওয়ায়" কি ক্ষতি হয় না লাভ হয়? ইতিহাস কি বলে? জওহরলাল ইংলণ্ডে স্পষ্টভাষায় বলে দিয়ে এসেছেন ভারতবর্ষ কি চায়, এবং কতখানি চায়, সুভাষচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় ইংলণ্ডে বলে এসেছেন ফেডারেশন ভারতবর্ষের উপর চাপিয়ে দিলে একটা আইন অন্যান্য আন্দোলন হতে পারে। কই তাতে তো স্বাধীনতা আন্দোলন নির্জ্জীব পঙ্গু হয়ে পড়ে নি!

নিয়মতান্ত্রিক দলের ওসব তর্ক একেবারেই ভুয়ো। বাস্তবিক গণ-আন্দোলনের মূল মন্ত্রই হলো সংগ্রামের রূপ এবং প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের সমূহ বিস্তার। প্রতি গ্রামে, প্রতি শহরে লোকে জানবে ফেডারেশন যদি ভারতবর্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়াই হয় তবে কি করতে হবে, তবেই না নেতৃত্বের আদেশের ফলে গণ-আন্দোলনের শুরু হবে। জনকয়েক নেতার মস্তিষ্কে সংগ্রামের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কি ধারণা আছে সেটা দিয়ে গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হয় না।

সাধারণের মাঝে সেই ধারণার বিস্তারেই গণ-আন্দোলনের বিস্তার।

অতএব "শত্রুপক্ষ জেনে যাবে' এই ভয়ে বন্ধুপক্ষকে যদি অন্ধ করে রাখা হয় তবে লোকে স্বভাবতঃই সন্দেহ করতে পারে যে নিয়মতান্ত্রিক দল বাস্তবিকই ফেডারেশন বিরোধী নয়।

এ সন্দেহ যদি সত্য হয় তবে অবস্থা গুরুতর। কেন না, নিয়মতান্ত্রিক দলের সঙ্গে গণের সংযোগ যদিও নেই, তবু তাদের সঙ্ঘগত ক্ষমতা যথেষ্ট। ওয়ার্কিং কমিটির অনেক সদস্য নিয়মতান্ত্রিক, এবং কংগ্রেস আন্দোলনের পরিচালনার ভার ওয়ার্কিং কমিটীরই উপর। ওয়ার্কিং কমিটীর সমর্থন না পেলে ফেডারেশন বিরোধী আন্দোলনে গুরুতর ক্ষতি হবে। অবশ্য ওয়ার্কিং কমিটী এখনও কংগ্রেসের ফেডারেশন বিরোধী প্রস্তাব নাকচ করেনি, কিন্তু তার জন্যে সুভাষচন্দ্রের পিছনে স্বাধীনতাকামী সমর্থনই দায়ী।

সেই সমর্থনের আভাষ সুভাষচন্দ্র পেয়েছেন নানা স্থানের সভাসমিতি থেকে। এই অ্যাভাবে বলীয়ান্ হয়ে সুভাষচন্দ্রকে এগিয়ে চলতে হবে, তবেই কংগ্রেসের মান বজায় থাকবে।

১৬ই জুলাই তারিখে "আনন্দবাজার পত্রিকার" সংবাদদাতা বেম্বাই থেকে লিখছেন "...কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশনে ঝড় বহিয়া যাইবে.....শ্রীযুক্ত বসুকে প্রত্যেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদত্যাগ করিতে হইত, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, কিন্তু মহাত্মাজী ব্যাপারটা এতদূর গড়াইতে দিবেন না। তাঁহার ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্ব আলোচনার সন্তোষজনক সমাপ্তি ঘটাইবে।"

আমাদের এ ধারণা নয়। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি। অনেকের যে ধারণা মহাত্মা গান্ধীরই জন্য তিনিকংগ্রেসের সভাপতি সেটা অর্দ্ধ সত্য।

বাস্তবিক জনসাধারণের উদগ্র মুক্তি কামনা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে প্রকাশিত, তাই তিনি কংগ্রেসের সভাপতি। সেই মুক্তি কামনা যদি সুভাষচন্দ্র হারিয়ে ফেলেন, অথবা সেই মুক্তি কামনা প্রতিহত করে নিয়মতান্ত্রিক দলের কাছে সুভাষচন্দ্র যদি পরাজয় স্বীকার করেন তবে তিনি নামে কংগ্রেসের সভাপতি থাকলেও কাজে হবেন অন্য কিছু।

ভবিষ্যতে যদি ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক দলের বিরোধ বাধে তবে সেটা হবে মুক্তিকামী জনসাধারণের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক শক্তির বিরোধ। সে বিরোধের সমাধান একমাত্র হতে পারে নিয়মতান্ত্রিক শক্তির সম্পূর্ণ পরাজয়ে—"ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বের" এ বিরোধে "মধ্যস্থতা" করার কোনো অর্থই হয় না, কেন না এ বিরোধে কোনো মধ্য পন্থার অস্তিত্ব নেই। হয় ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শাসন সংস্কার বর্জ্জন করতে হবে কিম্বা ফেডারেশনের সঙ্গে আপোস রফা করে সাম্রাজ্যবাদের কাছে পরাভব মানতে হবে। এ দুয়ের মধ্য পন্থা আবিষ্কার ইন্দ্রজালেই শুধু হতে পারে, সত্যে তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

সুভাষচন্দ্র যদি তাঁর সংগ্রামস্পৃহা অটুট রাখেন, সুভাষ চন্দ্র যদি অনুভব করেন যে তিনি আজ পক্ষ নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটী স্বাধীনতা কামী জনসাধারণের, সুভাষচন্দ্র যদি দৃঢ়ভাবে স্পষ্টভাবে গণ-সংগ্রামের পক্ষ নেন, তবে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ, এবং তাদের পক্ষ থেকে আমরা সমাজতন্ত্রীরা শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে সমর্থন করবো শুধু কথায় নয়, কাজেও।

কে পারে কার্য্যতঃ সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামকে শেষ পর্য্যন্ত সমর্থন করতে? পারে শ্রমিক, পারে কৃষক, পারে দরিদ্র, পারে সংগ্রামেচ্ছু জনসাধারণ। নিয়মতান্ত্রিক মুখে সায় দিলেও কাজে যে সায় দিতে পারে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুভাষচন্দ্র পেয়েছেন। কেননা নিয়মতান্ত্রিক গণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। গণ-সংগ্রামকে সে ভয়ের চোখে দেখে, শত্রুর চোখে দেখে।

সুভাষচন্দ্র বোধ হয় অনুভব করেছেন শক্তির আধার কোথায়। তাই তাঁকে আজকাল দেখতে পাই শ্রমিক অঞ্চলে। এখন তিনি যাচ্ছেন শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের মীমাংসা করতে। কাল তিনি দেখবেন ঐ শ্রমিকদের

মধ্য থেকেই স্বাধীনতার এমন এক শ্রেণীর যোদ্ধা বেরিয়ে আসবে যারা সবাইকে ছাপিয়ে যাবে, সবাইকে প্রকৃত নেতার মত এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজ যে শ্রমিকের প্রতি আছে তাঁর সহানুভূতি কাল তাঁর জন্মাবে সেই শ্রমিকের প্রতি শ্রদ্ধা।

কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য শ্রমিককে তৈরী করে তুলতে হবে। শ্রমিককে সংগ্রামে যোগ দেওয়াতে হবে, শ্রমিককে নেতা করে গঠন করে তুলতে হবে আজকের নেতাদের। এইখানেই সমাজতান্ত্রিকের দায়িত্ব।

ফেডারেশনের কি তা শ্রমিককে, কৃষককে, জনসাধারণকে বোঝাতে হবে। "শত্রুপক্ষকে জানিয়েই" জনসাধারণকে জানাতে হবে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কি প্রক্রিয়া। নইলে সময় যখন আসবে আন্দোলন তখন বিস্তার লাভ করবে না। আন্দোলনের ঘুরতে আসবে বিশৃঙ্খলা, লাভ তাতে হবে শত্রুপক্ষেরই।

একটী ডক শ্রমিকের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল ফেডারেশনের বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে। ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন যে প্রয়োজন তা সে নিজেই বল্‌লে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ফেডারেশন কি তা তুমি জানো? সে বল্‌লে, ঠিক কি তা আমি জানি না। হয়ত আমাদের কিছু কিছু সুবিধা এতে হবে, কিন্তু সে অতি সামান্য। আমি তাকে বললাম, সুবিধা তো হবেই না বরং আমাদের যেটুকু স্বাতন্ত্র্য লাভ হয়েছে তাও নষ্ট হবে। যখন ডক শ্রমিকটী শুনল বাস্তবিক যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা জিনিষটী কি—তাতে দেশীয় রাজ্যের প্রভুত্ব কত বেশী, বড়লাটের ক্ষমতার কত বহর তখন সে রুখে বল্‌ল, এই যদি ফেডারেশন হয় তবে তো দেশে একটা ঝড় বয়ে যাবে এর বিরুদ্ধে! এইখানেই দেখি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে প্রচারের প্রয়োজন।

আজ সুভাষচন্দ্রকে যেতে হবে ঐ শ্রমিকের কাছে। দেশের শ্রমিক আজ বিক্ষুব্ধ অর্থনীতিক নিপীড়নের তাড়নায়। সুভাষচন্দ্রকে, কংগ্রেসকে, সমাজতন্ত্রীকে, স্বাধীনতাকামীকে আজ যেতে হবে সেই বিক্ষুব্ধ শ্রমিকগণের নিকটে। ঐ বিক্ষুব্ধ শক্তিকে সংহত করতে হবে, কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিপত্তি দিয়ে শ্রমিকদের সাহায্য করতে হবে, যাতে শ্রমিক বোঝে কংগ্রেস তারই স্বার্থ দেখে। যেমন কানপুরের শ্রমিক বুঝেছে। তা হলেই শুধু কংগ্রেসের ডাকে শ্রমিক এগিয়ে আসবে, অন্যথা নয়। কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রমিকের আত্মিক যোগ ঘটতে পারে শুধু এক শ্রমিকের দৈনন্দিন সংগ্রামের ক্ষেত্রে। সেই দৈনন্দিন সংগ্রামেই সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গেই কংগ্রেসের যোগ ঘটবে—সেই সংগ্রামেই কংগ্রেসের সুযোগ ঘটবে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের বিষয় বস্তু এবং পন্থা কি তার প্রচারের।

ফেডারেশন সম্পর্কে শ্রীসত্যমূর্ত্তির যে বিবৃতি তার নানা বিশ্লেষণ হয়েছে একথা সত্য, কিন্তু তার মধ্যে একটা অভাব হচ্ছে সত্যমূর্ত্তির পরিকল্পনার বিষয় বস্তুর সমালোচনা। সুভাষচন্দ্রও শুধু বলেছেন "এ পর্য্যন্ত এমন কিছু ঘটেনি যার জন্য কংগ্রেসের ফেডারেশন সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তিত হতে পারে"। কিন্তু একথা কেউ বলেন নি যে এ পর্য্যন্ত যা **ঘটেছে** তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ফেডারেশনের প্রকৃত স্বরূপ কি রকম দাঁড়াবে। বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, সিন্ধু, বাংলা ইত্যাদি কয়েকটী প্রদেশে ইতিমধ্যেই কয়েকটী সঙ্কট ঘটে গেছে। বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের সঙ্কটের কারণ ভারত গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে প্রাদেশিক গবর্ণরদের মন্ত্রীদের কার্য্যাবলীতে হস্তক্ষেপ। তার সমাধান ভারতব্যাপী জনবিক্ষোভে। উড়িষ্যার সঙ্কট মন্ত্রীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গবর্ণর নির্ব্বাচনে। তার পরিসমাপ্তির কারণ ভারতের জন-সাধারণের প্রবল আপত্তি। সিন্ধু এবং বাংলার সঙ্কটের কারণে এই দুই প্রদেশের মন্ত্রী মণ্ডলীর কৃষকদের কথাঞ্চিৎ অনুকূলে গড়া দুটী আইন। ভারত গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে আইন পাশ হতে পারে নি, স্থগিত আছে।

এ থেকে কি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে না যে ভারতশাসন আইনে পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ কত ঘন ঘন হবে? এতো সামান্য ব্যাপারে, প্রাদেশিক

(শেষ অংশ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

যদি সরেস কাপড় চান তবে

মহালক্ষ্মী কটন্ মিলে

তৈরী কাপড়ের খোঁজ করুন।

মহালক্ষ্মীর মহাপদ্ম

উৎকৃষ্ট শাড়ী ও ধুতির বিশিষ্ট নিদর্শন।

মহালক্ষ্মী দেশী মিল, দেশের ছেলেরাই এখানে কাজ করে। মহালক্ষ্মী ক্রমশঃ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হবে—মনে রাখবেন সে আপনাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়।

মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ এচ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ

১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

M. C. K. 2.

সকল জাহাজী ভাইয়েরই পড়া উচিত

জাহাজী

সি-মেনদের সুখ, দুঃখ ও লড়াইয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

৩, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাজ রাজেশ্বরী ও সত্যনারায়ণ ঘৃত

আপনাকে আনিয়া দিবে

সংসারে-শ্রী, দেহে-কান্তি, মনে-শান্তি

এবং কর্ম্মে-প্রেরণা।

বাঁচিতে হইলে সবল ও নীরোগ হইয়া বাঁচুন!

পরিবেশন করেন

মহেশচন্দ্র, বংশীধর ও শ্রীবিপিন বিহারী কুণ্ডু

৬ নং রাম কুমার রক্ষিত লেন।

ফোন বড়বাজার ৪২৫০

প্রত্যহ

"যুগান্তর"

পড়ুন

বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা।

Read the

"National Front"

Leading Marxist Weekly of India

Published from :—62E, Girgaon Road, Bombay.

New Age

The only Marxist Monthly in English

Published from :—270, Triplicane High Road, Madras.

অগ্রণী ঃ—প্রগতি সাহিত্যের প্রচারক

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গণশক্তি পাবলিশিং হাউস

মার্ক্সবাদী ও জাতীয়তামূলক সাহিত্যের প্রচারক

অতি শীঘ্রই বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশ করা হইবে।

"ন্যাশনাল ফ্রন্ট" ও "নিউ এজ" পত্রিকা এইখানেই পাইবেন।

জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন ঃ—

ম্যানেজার, গণশক্তি পাব[illegible] হাউস

২৫নং, [illegible]নিয়াটোলা লেন, কলি[illegible]।

বিমল সেন—অনূদিত গোর্কীর

মা

১॥০]   [১॥০

[২য় সংস্করণ   দুইখণ্ড একত্র

"………পদদলিতের যে বেদনা, অপমানিতের নিস্ফল বিক্ষোভ, অত্যাচারের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ, এই পুস্তকখানিকে সাহিত্য-শ্রেণীতে অমরত্ব দান করিয়াছে। বইখানার প্রত্যেকটি চরিত্র, প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রতিটি ছত্র অগ্নিশ্রাবী ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। বিমলবাবুর অনুবাদ পড়িতে পড়িতে মনেই হয় না যে আমরা রুশ অথবা ইংরাজীর নকল পড়িতেছি।"—যুগান্তর

………গোর্কী যে উৎপীড়িত-শ্রেণীর 'মা'কে স্বীয় গ্রন্থে রূপ দিয়াছেন তরুণ অনুবাদক তাহা মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। তজ্জন্য অনুবাদ হইলেও গ্রন্থ মূলের মতই স্পষ্ট ও সুপাঠ্য হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা স্পষ্ট ও ঝরঝরে।—আনন্দবাজার

আমাদের প্রকাশিত

রাজনৈতিক পুস্তক—

১। লেনিন   সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর   ॥০

২। রোজা লুক্সেমবুর্গ   ঐ   ।৶০

৩। সমাজতন্ত্রবাদ—কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক (এঙ্গেল্‌স্)
ডাক্তার ভূপেন্দ্র দত্ত ও শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী অনূদি   ১৲

৪। আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
ঐ   (১ম খণ্ড) ১।০ দ্বিতীয় খণ্ড)   ১॥০

কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত—

৫। তরুণের অভিযান   ১৲   ৬। জাতি সংগঠন   ১৲

৭। রাজবন্দীর জবানবন্দী ৶০   ৮। ছায়ানট   ১।০

৯। সঞ্চিতা (সুলভ সংস্করণ) ১॥০   ১০। ফণি-মনসা   ১।০

১১। জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রবিপ্লব   জহরলাল বক্সী   ১৲

১২। কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র   ব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায়   ১৲

গণশক্তি পাবলিশিং হাউসের বই ঃ—

১। রাষ্ট্র ও আবর্ত্তন   সোমনাথ লাহিড়ী   ১॥০
(লেনিনের State & Revolutionএর অনুবাদ)

২। কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার   আবদুল হালিম   ℓ৹

৩। রাশিয়ার গণ-আন্দোলন   ঐ   ℓ৹

৪। কম্যুনিজম (এঙ্গেলস্)   ঐ   ।০

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস

১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

Published at 77, Chittaranjan Avenue, and printed at the Hindusthan Printing Syndicate at 25, Beniatola Lane, Calcutta, by Monoranjan Roy.